শক্তিপদ রাজগুরু

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৭১
প্রকাশক
সুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীসুভাষ চন্দ্র রায়
মাতৃ মুদ্রণ
৭ শিবনারায়ণ দাশ লেন
কলকাতা-৬।

উৎসর্গ

শক্তি সামন্ত
সুপ্রীতিভাজনেষু

খুব মন দিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে সুশান্ত। বারবার থার্ডমাস্টার হরিশবাবুর খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখখানা মনে পড়ে। লোকটাকে ভগবান ধরাধামে পাঠিয়েছেন তাদের পিছনে লাগবার জন্য। যতো কঠিন কঠিন সমাস, সন্ধি, ব্যাসবাক্য-টাক্য নিয়ে তার কারবার। ওসব জেনে কি হবে তাও ঠিক মাথায় ঢোকে নি সুশান্তর।

তার বাবাও বিরাট একটা চিনিকলের ম্যানেজার, গাড়ি হাঁকিয়ে চলেন। সেখানেও কি এসবের দরকার হয়! তাদের গ্রামের বিপুলবাবু মস্ত কন্ট্রাকটার সদরে বড় বাড়ি, কারবার আছে। তিনি তো এসব জানেন না। গণপতি দত্ত বাজারের সবচেয়ে বড় কাপড়ের মহাজন কয়েকটা দোকান, কতো কর্মচারী। টাকার আণ্ডিল নিয়ে বসে আছেন, তিনি কি জানেন এসব? ছাই।

আর এতো সব জেনে হরিশমাস্টারের কি হল? তবু বেইজ্জত হবার ভয়েই এই সব পড়তে হয় সুশান্তকে।

বাইরে কাছারিবাড়ির ভাঙা চত্বর থেকে কাকার ভারী গলার শব্দ ভেসে আসে। কাকে শাসাচ্ছেন বোধহয়। কাকামণির কান এখন অন্যদিকে, নাহলে এখুনিই সাড়া আসতো।

—এ্যাই কি করছিস?

সুশান্ত তখন হয়তো কোনো গল্পের বই পড়ছে। পড়ার বই-এর চেয়েও ওই সব বই পড়তে তার ভালো লাগে। মনে হয়, বিচিত্র একটি জগতে সে হারিয়ে গেছে। নীল পাহাড়গুলো আকাশ ছুঁয়েছে, তার বুকে গজিয়ে উঠেছে ঘন শালবন—কোথায় একটা ঝরনা বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সেই বনরাজ্য কাঁপিয়ে বাঘের গর্জন শোনা যায়।

কাকার ডাকে তখন চমকে ওঠে সুশান্ত। মনে হয় কাকামণিই যেন সেই

বাঘটা। অমনি কঠিন কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ছে—এ্যাই শান্ত, কি করছিস চুপ করে ?

সুশান্ত তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—অঙ্ক কষছি কাকু। এ্যালজেবরা—

জানে, অঙ্ক কষার সময় গলার শব্দ বের হবে না। কাকুকে এইভাবেই তখনকার মতো নিরস্ত করে সে।

এখন অবশ্য কাকু অন্য কাজে ব্যস্ত। কাকু এখন বোধহয় নোটন গোমস্তাকে ধমকাচ্ছে—

আদায় উশুল নেই মহাল থেকে, সবই যদি বাকি বকেয়ার ব্যাপার হয়, তোমারটাও বাকি থাকবে হে ?

সুশান্ত ওইসব সেরেস্তার ব্যাপার কিছু কিছু বুঝেছে। দেখেছে কাকু কিভাবে নিরীহ চাষী প্রজাদের ডেকে এনে ধমকায়। কাকে যেন সেবার কাছারি-বাড়ির থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। তার দোষ, সে নাকি গ্রামের আরও অনেক লোককে খাজনা না দেবার জন্য বলেছে। কোথায় নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের দখল নিয়ে সেবার কাকুই লাঠিয়ালের দল নিয়ে গিয়ে হামলা করে কাদের মাথা ফাটিয়েছিল। নীলে হাড়ীকেও দেখেছে সুশান্ত, কঠিন লোহার মতো শক্ত একটা মানুষ। লোকে বলে ও নাকি ডাকাত। সেই নীলে হাড়ীই কাকার সহচর।

সব মিলিয়ে সুশান্তর মনে একটা ভয় আর কিছুটা ঘৃণা জড়ানো ভাব ফুটে ওঠে। ওরা যেন ওই লোকগুলোর সবকিছু জোর করে ছিনিয়ে নিতে চায়।

সুশান্ত বইগুলো সামনে রেখে মাঝে মাঝে এমনি বিচিত্র ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়। এখানকার কঠিন শাসনের বাইরে উধাও হয়ে যেতে চায় তার কিশোর মন।

মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে। বাড়ির লাগোয়া মন্দির, নাটমন্দির। ওটা আলাদা একটা মহল। ওপাশে ভোগমন্দির—দরদালান। কাকীমার কাছে শুনেছে ওই রাধাকান্ত ঠাকুরেরই এসব সম্পত্তি, বিষয়-আশয়। তারা সেবাইত।

তবে ঠাকুরকে দেখিয়েই ওরা সব ভোগ করছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সুশান্তর, ওই ঠাকুর যেন একদিন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আর তাদেরকে বলছে,—এ সব কিছু আমার। তোমরা এতদিন আমাকে ঠকিয়ে সব নিয়েছ। এইবার এসব ছেড়ে দাও তোমরাও পথ ছ্যাখ।

সুশান্তর কথাটা ভাবতেও হাসি পায়। ঠাকুর জীবন্ত হয়ে এদের তাড়িয়ে দিলে তারা যাবে কোথায় ? কাকামণি, কাকীমা, তার দিদি মিলু, কাকার ছেলে-মেয়েরা কোথায় যাবে তাই দেখতে ইচ্ছা করে।

হরিশমাস্টার বলেন, ঈশ্বর দয়াময়। কিন্তু তাই যদি হয় তবে ঈশ্বরের নাম করে কাকাবাবু ওই প্রজাদের ধান কেড়ে আনেন কেন ? নীলে হাড়ীকে দিয়ে লাঠি সড়কি নিয়ে ওদের চরে হানা দেন কেন ? এইসব ঠিক বুঝতে পারে না সে।

কাকামণিকে দেখেছে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত হয়ে সুবিচার করার মহৎ কর্তব্য পালন করতে। দেওয়ালে গান্ধীজীর ছবি টাঙানো। ওর আগে সেখানে ছিল পঞ্চম জর্জের ছবি। সেটা খুলে ফেলে এখন নতুন ওইসব ছবি আনা হয়েছে। তাই নিয়ে কালীবাড়ির চত্বরে বিরাট মিটিং হয়েছিল।

বিপিনদা খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধুতি পরে হাত নেড়ে মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছিল। বিপিনদা নাকি সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বের হয়ে এসেছে।

কাকামণি ওকে দুচোখে দেখতে পারতো না আগে, কারণ বিপিনদা তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে গ্রামের স্কুলের ছেলেদের ডেকে মদের দোকানের সামনে, বলরাম দত্তের বিরাট কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে সবকিছু বয়কট করেছিল।

কাকামণি ছোটদাকেও ধমকাতো—খবরদার, বিপ্নের দলে যাবি না। ওটা স্বদেশী ডাকাত, খুনে। ও সব পারে।

ফর্সা চেহারা, চোখদুটো যেন তার ঝকঝক করে, লেখাপড়া জানে ; সেই বিপিনদা যে খুনে হতে পারে তা বিশ্বাস করতে চায় নি সুশান্ত।

ডাকাত খুনে বলতে নীলে হাড়ীকে ভাবতো সে। জবাফুলের মতো লাল

চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া একরাশ চুল, কালো পেটা চেহারা।
বিপিনদা তার তুলনায় দেবতা। সেই বিপিনদাকে প্রায়ই পুলিসে ধরে নিয়ে যেতো। কাকামণিও খুশী হতেন। বেশ দাপটের সঙ্গে পঞ্চায়েত আপিসে বসে বলতেন—ওসব বাঁদরামি ঠাণ্ডা করে দেবে হে। ব্রিটিশ শাসন!
কাকার ওখানে আসতেন গ্রামের অনেকেই। বোর্ড-আপিস কাছারি-বাড়ির লাগোয়া। ওটা নাকি আগে ছিল নাচমহল, এখন হয়েছে বোর্ড-আপিস। সকালের দিকে নরেন দত্ত, নৃপেন মুখুয্যে, আবগারীর দোকানের মালিক অসিতবাবু কণ্ট্রাকটার বিপুলবাবু আরও অনেকে আসতো। চা-এর চলন হয়েছে সবে। কাকামণি চা বিলাতেন ওদের। নরেন দত্তের হাতে ইংরেজী কাগজ। লোকটা ইংরেজী ছাড়া যেন আর কিছু পড়ে না।
নরেন দত্তও সায় দিত কাকার কথায়—সিওর। রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্। ওরা যা তা 'নেশন' নয় রণদাবাবু, দে উইল টিচ্ এ গুড লেসন্।
সুশান্ত অবাক্ হয়ে শুনতো ওই সব কথা। ওরা যে বিপিনদাকে দুচোখে দেখতে পারে না তাও জেনেছিল সে। দারোগাবাবুও প্রায় আসতেন এই চায়ের আসরে।
আর বিপিনদা, ওপাড়ার ন'তরফের সুশীলবাবু বলতেন এই আড্ডাকে 'ডেভিল্স্ ডেন' অর্থাৎ শয়তানের আড্ডা।

সুশান্ত তাই অবাক্ হয়েছিল সেবার কালীতলার মিটিং-এ কাকামণি, নরেন দত্ত ওদের সবাইকে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরে মিটিং করতে দেখে। ওই বিপিনদাই ছিলেন সেদিন প্রধান বক্তা। আর দারোগাবাবু এত দিন যে বিপিনদাকে ধরে ধরে থানায় এনেছিল, সদরে চালান দিয়েছিল, সেই দারোগাবাবু বিপিনদা, সুশীলবাবুকে রীতিমতো স্যালুট দিয়েছিল।
প্রভাত আর সে দুজনে এক কোণে বসেছিল। প্রভাত বলে—দেখছিস শান্ত, একেই বলে 'রগড়'।

রগড় কথাটা প্রভাত যত্র তত্র ব্যবহার করে। প্রভাত বলে—রাতারাতি সবাই বদলে গেল।

এই বিরাট পরিবর্তনটা দেখেছিল সুশান্ত। ঠিক তলিয়ে সবকিছু বুঝতে পারে নি—তবে মনে হয়েছিল কোথায় একটা কিছু ঘটেছে।

প্রভাতের বোন অতসী, দত্তবাড়ির রমা, তার দিদি মিলু—আরও অনেক মেয়ে ছেলে মিলে সেদিন গান গেয়েছিল—

জনগনমন অধিনায়ক জয় হে—

ওরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। গানের শেষে সকলে ধ্বনি দিয়েছিল—'বন্দে মাতরম্'। মায় কালী দারোগা অবধি। ওই কালী দারোগাই কিছু-দিন আগে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শুনে তেড়ে গিয়ে ছেলেদের ধরতো।

প্রভাত তাই বলে—দেখছিস রগড়! এঁ্যা।

বলিষ্ঠ সুন্দর ছেলেটা, প্রশস্ত কপালের উপর দু- একগাছি চুল উড়ে এসে পড়ে, চোখের চাহনি কেমন দৃপ্ত আর ঝকমকে। কি যেন দুরন্তপনা ওর চাহনিতে।

ছেলেটাকে ভালো লাগে সুশান্তর। সেই থেকেই ওদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। ক্লাসে দুজনে এক বেঞ্চেই বসে। তাই ফেলু তার দলবলকে নিয়ে লাস্ট বেঞ্চে বসে ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে ফোড়ন কাটে, মানিক জোড়।

প্রভাতও কথাটা শুনেছে। এমনিতেই সে একটু বেপরোয়া আর মার-কুটে। সে বলে—দেব একদিন ফেলুকে ঘা কতক ঝেড়ে, ওর ফোড়ন কাটা স্বভাব ঘুচিয়ে দেব।

ফেলু অবশ্য তাদের থেকে বয়সে অনেক বড়। প্রতি ক্লাসে দু-একবছর করে ফেল করে করে পাকা হয়ে উঠেছে। সেই রেগুলার ফেল করার জন্যেই তার নাম হয়েছে ফেলু। ভালো নাম অবশ্য একটা আছে, সেটা তোলা আছে পাকা খাতায়। ফেলু স্কুলের ফুটবল টিমের কায়েমী করা ক্যাপ্টেন। ভুতে, নুলো, হরিয়া আরও অনেকগুলো ধেড়ে ধেড়ে বখাটে

ছেলে তার সহচর। ওরা টিফিনের সময় পাশেই চৌধুরীদের বাগানে আমগাছের নিবিড় ছায়ায় বসে বিড়ি টানে ফুক ফুক করে। তারপর কচি পেয়ারার পাতা একটু চিবিয়ে বিড়ির গন্ধ মুখ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে এসে আবার পিছনের বেঞ্চ আলো করে বসে থাকে, কখনও বা জ্ঞানবাবু স্যারের ক্লাস এলে ওরা সারবন্দী ঝুলনের সখী হয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকে কেউ নিচে, কেউ বেঞ্চে।

ওদের দলকে ভয় করে সকলেই। তাই প্রভাতকে ওই ফেলুকে মারার পরিকল্পনা করতে দেখে বাধা দেয় সুশান্ত—ওসব করিস নি।

—তাই বলে যাতা ইয়ার্কি করবে? সেদিন কি লিখেছে জানিস ওই বাবুদের দেওয়ালে?

সুশান্তর বাড়ির শাসন একটু কড়া। যত্রতত্র যাবার কানুন তার নেই। তাই কোন্ দেওয়ালে কি লেখা হয় সেটা জানে না। সেইজন্যে সে শুধোয়

—কি লিখেছে রে?

—প্রভাত প্লাস সুশান্ত। ওদের সঙ্গে কথা বলি কম তাই এতো খার। এসব একদিন ছুটিয়ে দেব।

সুশান্ত ওই কথাটা শুনে অবাক্ হয়। শুনেছে ওইগুলো নাকি বিশ্রী কথা-বার্তা। রাগও হয় ফেলুর উপর। আমার মনে হয় এত ভিড়ের মধ্যে তবু প্রভাত তার প্রিয় সঙ্গী। এই সঙ্গটুকু ভালো লাগে। কেমন মিষ্টি লাগে ওর সাহচর্যটুকু! সেই ভালো লাগাটাকে ওরা সহ্য করতে পারে না, তাই ছিনিয়ে নিতে চায়।

মায়ের কথা মনে পড়ে। কেমন আবছা স্মৃতি সেই ছবিটা, দিনের শেষের মুছে যাওয়া আলো অন্ধকারের মেশামিশির মতোই, কেমন কান্না কান্না ভাব আসে মনে। এখানেই সুশান্ত অত্যন্ত দুর্বল নিঃসঙ্গ বোধ করে নিজেকে। মনে হয় তার কিছুই নেই। মা-কে হারিয়েছে কতোদিন আগে তখন মনে হয় নি যে বিরাট একটা ক্ষতি হয়ে গেছে তার। যতোদিন গেছে ক্রমশঃ সেই অভাবটা আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে।

এই যন্ত্রণার কথা কাউকে বলতে পারে নি। মিলি ওর দিকে চেয়ে থাকে সন্ধানী দৃষ্টিতে, শুধোয়—চুপ করে আছিস কেন রে শান্ত? কি হয়েছে? সুশান্ত ছাদে একা দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, বড়বোন মিলিকে দেখে এড়াবার চেষ্টা করে—কই! কিছুই হয় নি তো! এমনিই দাঁড়িয়ে আছি! সরে যায় সে। কাকীমাও মাঝে মাঝে শুধোয়।—আনমনা হয়ে থাকিস, মিলু বলে কি যেন ভাবিস!

মায়ের কথা মনে পড়ে। কপালে সিন্দুর, ডাগর মিষ্টি দুটো চোখের চাহনি যেন দূর আকাশের ওই তারার মতো বহুদূর থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। কি যেন বলছে সে আর সেই ভাষা কিছুই বোঝে না সুশান্ত। হু-হু বাতাসে গুমরে ওঠে তার চাপা কান্নার স্বর।

এসব কথা কাকীমাকেও বলতে পারে নি। তাই বলে—কি ভাবব কাকীমা? মিলুদির ওসব বানানো কথা।

সুশান্ত কাকীমাকেও জানাতে পারে নি মায়ের জন্য তার সারা মন জুড়ে হাহাকারের কথা। দিদিটা তবু হয়তো কিছু জেনেছে, হয়তো তার মন কাঁদে মায়ের জন্য।

সেদিন সন্ধ্যার পর আরতির কাঁসর ঘন্টা বাজছে। ঝুলন পূর্ণিমার রাত। ছাদ থেকে গ্রামের গাছ-গাছালির মাথা টপকে ময়ূরাক্ষীর জলের বিস্তারে চাঁদের আলোয় যেন রূপালী ঢল নেমেছে। একটু আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার ফলে, গাছগুলো নরম ভিজে ভিজে হয়ে আছে। তাতে চাঁদের আলোর ছোঁয়া কেমন যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে। বাগান থেকে বেল, রজনীগন্ধার মিষ্টি গন্ধ ওঠে। সেই চাপা স্নিগ্ধ সুবাস ছিল তার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে মেশানো।

—শান্ত!

সুশান্ত চেয়ে থাকে দিদির দিকে। ওর কালো ডাগর চোখে এক চামচ জল টলটলিয়ে ওঠে। মিলুদির বিয়ের ঠিক হয়ে যাবে শীগগির। ক'মাস

পরই সে চলে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। মেয়েরা বড় হলেই এমনি করে চলে যায়। শান্ত চেয়ে থাকে দিদির দিকে। সেই ছোট মেয়েটি এখন শাড়ি পরে। ওর মুখের আদল তার মায়ের মতোই।

মিলু বলে—মাকে মনে পড়ে তোর? এই ঝুলন পূর্ণিমার দিন মা মারা গেছল।

শান্তর দুচোখে জল নেমে আসে শাওন ধারার মতোই। মিলু বলে—কাঁদিস না শান্ত। মা দুঃখ পাবে। ছাখ, আমি কাঁদি নি।

দুটি নিঃসঙ্গ মাতৃহারা কিশোর-কিশোরীর মনে একটি স্মৃতির করুণ সুর কি যন্ত্রণাভরা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সুরটাকে ভোলে নি শান্ত।

এমনি দিনে সে দেখেছিল প্রভাতকে। ওই প্রভাতই নিয়ে গিয়েছিল তাকে তাদের বাড়িতে। প্রথম দিনের সেই ছবিটা এখনও সুশান্তর মনের গহনে আঁকা রয়ে গেছে। হঠাৎ যেন কি এক পরম পাওয়ার সন্ধান পেয়েছিল সে, যাকে এতদিন খুঁজে খুঁজে এসেছে। কি নতুন সুরে তার মন ভরে উঠেছিল।

…ঠুক ঠুক ঠুক!

শব্দটা উঠছে ওপাশে জানলার কাছে। ওটা তাদের একটা সংকেত। একবার দরজার দিকে চাইল সে সাবধানী দৃষ্টিতে। কাকামণি তখনও কোনো গোমস্তাকে ধমকে চলেছেন। এদিকে নজর দেবার মতো সময় তাঁর নেই।

ফিসফিসিয়ে ওঠে প্রভাত—বের হয়ে আয় শান্ত।

সুশান্ত বের হয়ে এল কাছারিবাড়ির এদিকের গলিতে। এদিকটা নির্জন, কয়েকখানা পুরোনো বাড়ি এখন ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে। তাই এখানে কেউ আসে না।

প্রভাত বলে—যাচ্ছিস তো ভোজ খেতে?

অধিকারিবাবুদের বাড়িতে রাসযাত্রা উপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন।

তাদেরও নেমন্তন্ন আছে। আর ভূরিভোজের ব্যাপারের চেয়েও কেমন খুশী খুশী লাগে—কতো লোকজন, ছেলেমেয়ে যায়। বিরাট দরদালানে পূজা-মণ্ডপে সারবন্দী পাতা পেতে বসে তারা।

টাটকা ভাজা লুচি থেকে ভয়সা ঘিয়ের মিষ্টি গন্ধ ওঠে। তরকারি, মাছের কালিয়া, চাটনী দই-এর পর শুরু হয় রকমারি মিষ্টান্নের। কোন্ বাড়ি কত রকম মিষ্টি পরিবেশন করল তারই হিসাব চলে বেশ কিছু দিন। নিদেন পাঁচ-সাত পদের মিষ্টি হবেই। বালুসাহী—ছানাবড়া—চমচম—রসগোল্লা—রসকদম্ব এসব তো থাকবেই।

তাদের বাড়ির কাজকর্মে কাকামণি নিমতিতা থেকে কারিগর আনান। ওদিকের কারিগরই নাকি খুব নামকরা। প্রভাত বলে—ফেলুও যাবে। মনি, গুপী তো খবর এনেছে। এবার নাকি বিরাট ভোজ হচ্ছে! পঞ্চগ্রামী নেমন্তন্ন।

দুপুর হয় নি। এর মধ্যে গ্রামের পথে লোকজনের চলাফেরা বেড়েছে। অধিকারিদের বড় বাড়ির ছাদটা দেখা যায়। ওরা অন্য এক তরফের জমিদার। এখনও রমরম অবস্থা তাদের। ওরা ভূরিভোজের ব্যবস্থাই করবে। সেই উৎসবমুখর পরিবেশে যেতে খুবই ইচ্ছে করে। কিন্তু সেখানেও যাবে ওই হরিশমাস্টার। সমবেত পঞ্চগ্রামী লোকদের বসার ব্যবস্থা হয় নাটমন্দিরে। কাকামণি, নরেন দত্ত, যাদব ঘোষ, আরো গ্রামের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা যান, তাছাড়া আশেপাশের গ্রামের অনেকেই আসেন। স্কুলের মাস্টারমশাইরাও সেখানে নিমন্ত্রিত। তাঁদের মাঝে হরিশ-মাস্টার নিজের পাণ্ডিত্য ফলাবার জন্য তাবৎ ছেলেদের ডেকে ডেকে শুধাবে—এক কাহন খড়ের দাম তেইশ টাকা তিন আনা হলে দুপণ সতের গণ্ডা খড়ের দাম কতো? বল।

ওই খড়ের হিসাব না করে দিলে যেন খাবার অনুমতি মিলবে না।

পরক্ষণেই অন্য বাণ নিক্ষেপ করে হরিশমাস্টার—এক টাকা আট আনা মণ দরে তের সের সাত ছটাকের দাম কতো? এ্যাই ইস্টুপিড-এর দল,

জবাব দে। ক্লাশ নাইন-টেনে পড়ছে বিদ্যের দৌড় দেখ না হে? এ্যাঁ—ওই মানসাঙ্ক আর কুটকচালো খড় তেলের দামের প্রশ্নে উপস্থিত ছেলেদের আনন্দ কলরব থেমে যায়। জানে ওদের বাবা-কাকারা রয়েছেন এখানে। এই উত্তর না দিতে পারার ফলটা বাড়িতে গিয়ে কানের উপর ফলবে। ফলেও!

···তাই নেমন্তন্ন আর হরিশমাস্টার তাদের কাছে বিরাট একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। সুশান্ত বলে—যাব কি করে বল? ওই হরিশমাস্টারের ঠ্যালাতে যে গলা দিয়ে লুচি মণ্ডা ঠেলে উঠে আসবে। সেদিন মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। ওই হরিশপণ্ডিতই বোধহয় লাগিয়েছে। কাকামণি যা কড়কে দিল? আবার ওই হিসাবের গুঁতোয় আজ ঘায়েল হয়ে গেলে ভেবেছ রক্ষে থাকবে?

প্রভাত হাসছে।

দুজনে ধ্বসেপড়া বাড়ির রাজ্য থেকে বের হয়ে সামনের পুকুরের ধারের পথ দিয়ে চলেছে। ওদেরই সরিকান পুকুর, দুদিকে বাঁধানো ঘাটলা। বড় বাড়িগুলোর আড়ালে এখানে রোদ আসে না। দু-একটা সুপারি নারকেল গাছ উপরের দিকে মাথা তুলেছে রোদের আশায়। সোনালি চাঁপাফুল ফোটা গাছটায় এখন ফুল নেই। শীতের শিরশিরে হাওয়া বইছে, দু-একটা খেজুর গাছের কামানো জায়গা থেকে তখনও রস টিপটিপ করে ঝরছে দু-এক ফোঁটা, বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ওঠে।

ওদের বাড়ির কাছে এসে গেছে তারা। ওই জমিদারপাড়ার এদিকে বাড়িটা, সামনে মাধবীলতার সবুজ ঝোপ, কয়েকটা নারকেল খেজুর গাছের জটলা এখানে।

এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে সেদিন সুশান্ত কি যেন একটা আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিল। বাড়িটার চারিদিকে স্নিগ্ধ সবুজের আভা। এর অন্তরেও তেমনি একটি স্নেহময় রূপকে দেখেছিল সুশান্ত।

…প্রভাতের বাবা শশধর মুখুয্যের বাজারে দোকান আছে। বেশ বড়সড় একটা মনিহারী দোকান। বেঁটে খাটো ভদ্রলোক—চোখে চশমা লাগিয়ে দোকানে বসে থাকে। কাঠের আলমারি আর শো-কেশে নানা শিশি—রঙীন কাগজ মোড়া জিনিসপত্র, পাউডার, স্নো-এর ভিড়। সদর শহর থেকে দূরের এই গণ্ডগ্রামের বাজারে বেশ ভালো কারবারই ফেঁদেছে শশধরবাবু

বাজারে যাবার মুখে শশধরবাবু ওদের দেখে দাঁড়াল—কি ব্যাপার ছোট-বাবু? এ্যাঁ—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

হাজার হোক জমিদারগোষ্ঠী। এককালে ওদের বাবা কাকার ঠাকুর্দাদের রমরম সে দেখেছে। এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া সুশান্তর বাবা লেখাপড়ায় ভালো, এম. এ. ল পাস করে কোথায় ভালো চাকরি নিয়ে রয়েছেন। জমিদারির দিনও বোধহয় ফুরিয়ে আসছে। তবু শশধরবাবুর ওই ছেলেটিকে খুব ভালো লাগে। মিষ্টি সহজ চেহারা, লেখাপড়াতেও সুশান্ত ভালো। স্কুলে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। ধেনো জমিদারদের অনেক বংশধরকেই সে দেখেছে এই গ্রামের মাটিতে। এই বয়স থেকেই তারা লায়েক হয়ে গেছে। বখাটে সেই ছেলেদের মতো ও নয়।

সুশান্তকে তাই ভালো লাগে শশধরবাবুর। এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। শশধরবাবু তাকে আদর করে ওই ছোটবাবু বলেই ডাকে।

সুশান্ত হাসবার চেষ্টা করে জানায়—চলছে একরকম।

—স্কুলে ফার্স্ট হতে হবে। সামনের বারই তো ফাইন্যাল, প্রভাতকে তাই বলি—ট্রাই টু বি গুড বয়। এ্যাঁ।

শশধরবাবুর ওই একটা মুদ্রাদোষ। কথায় কথায় এ্যাঁ বলবেই। আর একবার কথা শুরু করলে শেষ হবে ওই হিতোপদেশে এসে। শশধরবাবু বলে চলেছে—বুঝলে, ছাত্রদের চাই অধ্যবসায়—নিষ্ঠা আর নৈতিক বল। আমাদের সময়ে আমাদের আদর্শ ছিল স্যার পি. সি. রায়, আশুতোষ মুখুয্যে, সূর্য সেন এঁরাই। বাঙালীকে আজ আবার নতুন করে মাথা তুলে

দাঁড়াতে হবে। তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কাছারিবাড়ির পেটা ঘণ্টায় এগারটা বাজল। ধ্বংসপ্রায় জমিদারগোষ্ঠীর মধ্যে ওই ছোট তরফ এখনও বেঁচে আছে খানিকটা। কলকাতায় কি সব ব্যবসা আছে। সেই সুবাদেই এই বাড়িখানা এখনও একটু ছিমছাম। দেউড়িটা ধ্বসে পড়ে নি। টিঁকে আছে আর ক'জন নড়বড়ে জমাদার, ও তারাই ওই ঘণ্টা পিটে সময় জ্ঞাপন করে।

শশধরবাবুর লেকচার থেমে যায়। জামার পটেক থেকে কালো কারে বাঁধা গোলমতো একটা পকেট ঘড়ি বের করে বলে—চলি হে, ওদিকে দোকানে খদ্দের জমে থাকবে।

শশধরবাবু দৌড়ল, ভদ্রলোক সংসারের সাতে পাঁচে থাকে না। দোকান আর আড্ডা এইতেই ব্যস্ত থাকে, মাঝে মাঝে মাল গস্ত করতে সদরে না হয় কলকাতা যায়।

—তোমরা! ওমা শান্ত এসেছিস? আয়—

ওদের গলার শব্দ শুনে প্রভাতের মা বাইরে এসেছিল। সুশান্তও প্রভাতের মায়ের দিকে এগিয়ে যায়। সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ, ফর্সা, ভারিক্কী চেহারা, কপালে সিন্দুরের টিপ। লালপাড় শাড়িতে যেন মহিমময়ী দেখায় ওকে। সুশান্তর মনের পটে তার নিজের মাকে কেন্দ্র করে আঁকা ছবিটার সঙ্গে নিবিড় মিল রয়ে গেছে। সেই পরম সত্যটা সে আবিষ্কার করেছিল প্রথম দিনই এখানে এসে।

ভবতারিণীও জানে সুশান্তর দুর্ভাগ্যের কথা। ওর মাকেও দেখেছে সে। আলাপও ছিল ভবতারিণীর সঙ্গে। জমিদারবাড়ির বৌ গিন্নীদের সাধারণের সঙ্গে মেশার কিছু বাধা ছিল। তাই সম্পর্কটা ঠিক সহজ হতে পারে নি। তবু দুজনের মধ্যে একটা প্রীতির স্পর্শ ছিল। ভবতারিণী তখন মাঝেমাঝে যেতো ওদের বাড়িতে।

বিদেশে স্বামীর ওখানে গিয়ে মারা যায় সুশান্তর মা। সুশান্ত, মিলু তখন ছোট। পরে ওদের দুজনকে এখানের বাড়িতে তাদের কাকীমার কাছে

রেখে যান ওর বাবা। ভবতারিণী মা-মরা ছেলেটিকে প্রথম দিন প্রভাতের সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসতেই কি গভীর স্নেহে ওকে কাছে টেনে নেয়। ওর মাথায় সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে বলে—কতো বড় হয়েছিস শান্ত!

সুশান্ত সেই মুহূর্তটিকে আজও ভোলে নি। বার বার ওই মাতৃমূর্তির দিকে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল একদিন যে শূন্যতায় হাহাকার বুকে নিয়ে ঘুরেছে সেটা যেন কিছুটা শান্ত হয়েছে হঠাৎ। এই নীরব তৃপ্তিটুকু তার একারই। এ তার মনের গহনের একটি পরম সম্পদ।

ভবতারিণী সেদিন ওকে খেতে দিয়েছিল ঘরের তৈরি নারকেল সন্দেশ আর ঘি মাখানো মুড়ি। সুশান্তর লজ্জা করেছিল দেখেছিল একটি মেয়ে ফর্সা রং, মাথার চুলে লাল ফিতে বাঁধা, কালো বড় বড় চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা চোখ বুজে তার দিকে জিব বের করে ভেংচি কেটে সরে গেল আড়ালে।

—খাও শান্ত!

শান্ত খাবার চেষ্টা করে। চোখ তুলতেই দেখে ওদিকের থামের আড়াল থেকে সেই মেয়েটিই কিল দেখাচ্ছে তাকে।

হঠাৎ ভবতারিণীর নজরে পড়ে যায় ব্যাপারটা।

—এ্যাই মুখপুড়ি। এদিকে আয়। ওখানে দাঁড়িয়ে স্রেফ বাঁদরামি করছিস কেন? আয়—

মায়ের ডাকে এগিয়ে এল মেয়েটি। ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে, তবু রোখ যায় নি। ভবতারিণী বলে ওকে—দাদা হয়, পেন্নাম কর।

কেয়ার আত্মসম্মানে লাগে। মাথা নেড়ে জানায়—ওইটুকু পুচকে ছেলেকে আবার পেন্নাম করতে হবে! যাঃ ও তো দাদার মতো।

—মরণ! তবে ভেংচি কাটবি নাকি? এক গ্লাস জল এনে দে।

এটাও তার পরাজয়েরই নিদর্শন, তাই কেয়া মুখ গোঁজ করে জলের গ্লাসটা এনে ঠক করে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সুশান্তর দিকে কটমটে দৃষ্টিতে চেয়ে। ওর এই পরাজয়ের জন্য সুশান্তই যেন দায়ী।

কেয়াকে সেইদিনই প্রথম দেখেছিল। কয়েকটা মাস বছর কোন্ দিক দিয়ে চলে গেছে। আজ সেই ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়েটাও বড় হয়ে শাড়ি ধরেছে।

—কিরে। সুশান্ত ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সুশান্ত আর প্রভাত বাড়িতে ঢুকছে। শশধরবাবুকে ভবতারিণী কি যেন বাজার থেকে আনার কথা বলতে গিয়েছিল। শশধরবাবুর এমনি ভুলো মন দোকানে গিয়ে আড্ডায় সব ভুলে যাবে।

ভবতারিণীকে তাই একই কথা বার বার মনে করিয়ে দিতে হয়। শশধর-বাবুকে সেই কথাটা আবার বলছে, বাড়িতে ঢুকে এসেছে সুশান্ত আর প্রভাত। সুশান্ত কেয়াকে দেখে এগিয়ে যায়।

কেয়া একটা নতুন শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরাটা এখনও রপ্ত হয় নি। তবু ফ্রক পরতে কেমন অস্বস্তি বোধ করে। ওর সদ্য জাগর দেহের একটা সাড়াকে সে শাড়ির আবরণে ঢেকে রেখে স্বস্তি পায়। তা ছাড়া নিজেও দেখেছে কেয়া শাড়ি পরলে সে নিজেকেই যেন চিনতে পারে না। মনে হয় বিচিত্র একটি মেয়ে। তার দেহে নবাগত একটা উপছে পড়ার আভাস, যেন ময়ূরাক্ষী নদীতে সবে বর্ষার গেরুয়া ঢল নেমেছে। মনের অতলে কোথায় গুনগুন স্বর ওঠে। একটা বিচিত্র সৌরভ ছড়ানো বাতাসে সে যেন ঘ্রাণ নিচ্ছে।

সুশান্তকে দেখে ওর দিকে চাইল।

সুশান্ত বলে—শাড়ি পরে একেবারে বদলে গেছিস। এ্যাঁ!

জবাব দেয় কেয়া—নয়তো কি তোমাদের মতো হাফ প্যান্ট পরে ধেড়ে খোকা হয়ে ঘুরবো?

নিজের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সে। প্রভাত ফোড়ন কাটে—পাকা গিন্নী হয়ে উঠেছিস না? দোব এক চাঁটিতে মাথার ঘিলু জল করে।

পুজোর ফুল তুলছিল কেয়া, হাতের সাজিটা নামিয়ে রেখে ফুঁসে

দাঁড়িয়েছে। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো কেশরের মতো ফুলে মুখে এসে পড়েছে। শাড়ির আঁচলটা কোমরে কসে জড়াতে জড়াতে মারমুখী হয়ে চ্যালেঞ্জ করে—আয় দেখি তুই কতো বড় বীর।

এই রণমূর্তিটা সুশান্তর ভালোই লাগে। এরকম ছোট খাটো সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটে।

ভবতারিণী ফিরে এসে এই যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখে শাসায় মেয়েকে—কি হচ্ছে এই মুখপুড়ি। বড় হয়েছিস এখনও ওই দস্যিপনা গেল না। পূজোর ফুলের সাজি মাটিতে নামিয়ে লড়াই করতে চলল! মরণ!

বাধা পেয়ে কেয়া শোনায়—আমারই যতো দোষ! আর ওই ছেলের কিছুই দোষ নেই, এ্যাঁ।

প্রভাত শাসায়—আজ তোকে নেমন্তন্নে নিয়েই যাব না।

—না যাস, একাই যাব। ফুলুদি, রানী, বিলু, যাঃ যাঃ আমার আবার বন্ধুর অভাব! ক ক্ তো! তোদের মতো হরিশমাস্টারের ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে বসে থাকি না।

দাপাচ্ছে কেয়া, প্রভাত হাসছে। হঠাৎ কেয়া বলে ওঠে—কি করেছিস দোব ফাঁস করে?

প্রভাত চমকে ওঠে। কি যেন একটা বিরাট অপকর্মের জন্য প্রভাতকে ও শাসাচ্ছে। সুশান্ত শুধোয়—কি রে কেয়া!

প্রভাতই বলে—সে পরে বলব। চল এখন। দেখি নিতু গুপীকে।

প্রভাত এড়িয়ে যেতে চায় ওকে। কোনোরকমে সুশান্তকে নিয়ে বাইরে এল। ভবতারিণী বলে ওঠে—আবার বেরুলি কোথায় ভুটোতে?

—আসছি। প্রভাত হাঁফ ছেড়ে জানান দিয়ে চলে গেল।

তখনও কেয়া ফুঁসছে—দোব হাটে হাঁড়ি ভেঙে। যেমন উনি আর তেমনি ওই শান্তদাও, ভুটোতেই ষড় করে এইসব করেছে।

—কি করেছে রে! ভবতারিণীও ব্যাপারটার মধ্যে একটা সন্দেহের গন্ধ পেয়েছে। তাই শুধোলো। কেয়া কি ভেবে চেপে যায়।

দুপুরের মুখ থেকেই অধিকারি বাড়ির বিরাট চণ্ডীমণ্ডপে গ্রাম গ্রামান্তরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছেলেমেয়ের দল হাজির হয়েছে। পঙ্কের কাজকরা থাম-ওয়ালা বড় চণ্ডীমণ্ডপে ঝাড় ঝুলছে, নিচের বিরাট উঠানে সামিয়ানা চাঁদোয়া টাঙ্গানো।

নোতুন হুঁকো বের হয়েছে ডজন দরুনে। জাঁকিয়ে আবার বসেছে বয়স্ক ভদ্রলোকেরা—শশধরবাবু, সুশান্তর কাকামণি, ন'তরফের বাবুরা, স্কুলের হেড মাস্টার নলিনীবাবু, রায়চৌধুরী মশায়, নিতু ডাক্তার, বিমল ডাক্তার আরও অনেকে আছে।

ছেলের দল তফাতে ওই সামিয়ানার নিচে কলরব করছে। মেয়েরাও চেষ্টা করে শাড়ি গহনা পরে এসেছে, ওই দলে কেয়াও রয়েছে। ছেলেদের মনে ভীতসন্ত্রস্ত ভাব।

ফেলুও দলবল নিয়ে এসেছে। বলে সে—কি রে ন্যাড়া, হরিশ এলেই তো ভিড়ে সটকাতে হবে? ওর জন্য কি খেতে টেতেও পাব না?

ন্যাড়া মুখে বীরত্ব দেখায়—আসুক না ওই খড় ধানের অঙ্ক সব পটাপট বলে দেব।

ফেলু বলে—শান্ত, ওই হরিশের উপর নজর রাখিস। এলেই ম্যানেজ করতে হবে। তোরা তবু গুড বয়। তোদের ডাকবে না। আমাদের যে পঞ্চ-গেরামী সমাজের সামনে গুয়ে গোবরে করে দেবে র‍্যা!

ওরা নজর রাখছে কখন হরিশচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। ওই ফাঁকে ফেলুই খবর দেয়!

—এবার কান্দীতে বিরাট মেলা বসেছে। যা সার্কাস এসেছে না? বিরাট! হাতি বাঘ সিংহ কি নেই? আবার সিনেমাও বসেছে। বিজলীবাতি জ্বলছে, অন্ধকার রাতকে বুঝলি, দিন করে দিয়েছে। যাবি?

সুশান্তও কথাগুলো শুনছে। প্রভাতের মামার বাড়ি বহরমপুর শহরে। ওই পথ দিয়ে যায় সে। কান্দীতেও কোন্ এক মামা থাকে, ওখানে ওকালতি করে।

প্রভাতের যাবার পথ আছে, কিন্তু সুশান্তর কোনোও উপায় নেই। অথচ বড্ড ইচ্ছে করে এই পরিবেশের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে সে একবার ওই নতুন বিচিত্র আলো-ঝলমল স্বপ্নরাজ্যটাকে দেখে আসবে।

সুশান্তর শূন্য মন মাঝে মাঝে এমনি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বাবাও রয়েছেন দূর কোন্ শহরে। দু-চারবার ছুটিতে বাড়ি আসেন। চেনাপরিচয়ের কোনো ঘনিষ্ঠতা নেই, বন্ধনটাও অনেক ক্ষীণ।

মায়ের কথা মনে পড়ে, সেখানেও বিরাট একটা শূন্যতা। সব কিছুই তার হারিয়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের দেখেছে, দেখেছে প্রভাতের জীবনেও কি একটা পূর্ণতার ছবি সব মাধুর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। তার তুলনায় সে নিঃস্ব রিক্ত!

এই শূন্যতার বেদনাই তাকে এমনি উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। কাকামণির শাসনটা তাই তার কাছে শূন্য কাঠিন্যে ভরা একটা বেদনাদায়ক অনুভূতি। এর থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে সে।

হঠাৎ চমক ভাঙে তার। সেই নিঃস্বতার বেদনা তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, নিজের মনের নিভৃত কোন্ স্বপ্ন দেখা সুর আর আলো ভরা কোন্ জগতে। সেখান থেকে ফিরে আসে এই কোলাহলের মাঝে।

কে বলছে—ছেলেমেয়েরা সব নিচের পাতায় বসবে। গোলমাল কর না।

পাতা হয়েছে। সারবন্দী শালপাতা, ধারে ধারে মাটির কটরা গেলাস সাজানো। উপরের চকবন্দী চণ্ডীমণ্ডপ আর এপাশের বিস্তীর্ণ দরদালানে বয়স্কদের পাতা করা হয়েছে।

ফেলু তখনও সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে জানায়—গড ইজ গুড! হরিশ্চন্দ্র আজ অ্যাবসেণ্ট। এঁ্যা, এ যে অষ্টম আশ্চর্য রে?

বয়স্করাও ওর অনুপস্থিতিটা অনুভব করেন। নরেনবাবু—শান্তর রাঙা-কাকা ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কাকে দিয়ে। সে এসে খবর দেয়—মাস্টারের পেট খারাপ। ঘন ঘন তলব চলছে আজ্ঞা।

ছেলের দল কলরব করে ওঠে—থ্রি চিয়ার্স ফর হরিশ্চন্দ্র!

বয়স্কদের মধ্য থেকে কাকামণি বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন—এ্যাই, চুপ কর।

প্রভাত ফিসফিসিয়ে ওঠে—হরিশমাস্টার আজ আসতে পারবে না তা জানতাম।

ওদিকে মেয়েদের মধ্যেও কেয়া দেখছে মিনিকে। হরিশমাস্টারের ওই ঝগড়াটে দামাল মেয়েটাও চোখ কান খাড়া রেখে শুনছে কথাগুলো। তার বাবার শরীর খারাপ হয়েছে একটু বেলা থেকেই। কিন্তু তার পিছনে একটা কারণ কিছু আছে সেটা অনুমান করেছে সে। কেয়ার কথায় তেমনি সন্দেহের গন্ধই পায় ধূর্ত মেয়েটা।

তাই শুধায়—কি ব্যাপার রে, মুখপোড়ারা এতো খুশী কেন? ওই ফ্যালা প্রভাতের দল।

কেয়া কি ভেবে থেমে গেল। ব্যাপারটা সে জানে।

প্রভাতের কথায় ফেলু জেরা করে—

তুই জানতিস তাহলে, আগে বলিস নি কেন? কি তন্‌ছিট্ না করছিলাম। বুঝলি, রায়চৌধুরী বাড়িতে রাসের ভোজেও ওটাকে অ্যাবসেণ্ট করতেই হবে। থ্রি চিয়ার্স ফর প্রভাত এণ্ড শান্ত কোম্পানি!

কেয়া চুপ করে খাচ্ছে, দেখছে মিনি ডাগর চোখ মেলে ওই ছেলেগুলোর দিকে চেয়ে আছে। কোথায় একটা রহস্য রয়ে গেছে মিনি ধূর্ত বুদ্ধি দিয়ে সেটা টের পেয়েছে।

সুশান্তকে তারও ভালো লাগে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। কালো ডাগর দুটো চোখ। মিনি দেখেছে ওকে সাইকেলে করে স্কুলে যেতে। জানে বাবুদের ছোট তরফের বাড়ির ছেলে, ইদানিং কেয়াদের বাড়িতেও প্রায় যাতায়াত করে তা জানে।

কেয়া আর মিনু একই ক্লাসে পড়ে। তার তুলনায় কেয়া দেখতে আরও সুন্দর, তাছাড়া মিনু জানে তাদের সংসারের অবস্থা। বেশ কয়েকটা ভাই-বোন। বাবার ওই সামান্য রোজগারে কোনোমতে চলে মাত্র, ভালো জামা

কাপড়ও জোটে না।

এই খামতিগুলোর জন্য মনে মনে মিনু আরও সাবধানী আর হিসেবী হয়ে উঠেছে। মনে মনে সে ওদের সকলকেই হিংসা করে।

আজ ও দেখেছে বাবার উৎসাহ। দু তিন দিন আগে থেকেই বাবা গল্প শুরু করেছে, অধিকারিদের বাড়ির ভোজে কি কি হবে সে খবরও জানায়। বাবার ভালোমন্দ খাবার দিকে খুবই নেশা, কিন্তু মিনু জানে বাবার ওসব জোটাবার সাধ্য নেই।

আজ সকাল থেকেই বাবা কতো আশা করেছিল এখানে খেতে আসবে, কিন্তু তা হয় নি। হঠাৎ দাস্ত শুরু হতেই কাহিল হয়ে যায়। মিনুই ছোট ছোট ভাইবোনগুলোকে নিয়ে খেতে এসেছিল। সেই ফাঁকে তবু পাতায় বেশী করে সন্দেশ মিষ্টি নিয়েছে আর সেগুলোকে গেলাসে ঘটিতে তুলে ফিরছে। তবু কাল সকালেও জলযোগ করতে পারবে। বাবার জন্য মন কেমন করে। মিনু কি কৌতূহল নিয়েই শুধোয়—শান্ত, ওরা কি সব বলছিল? বাবা না আসাতে ওরা খুব খুশী হয়েছে না?

সুশান্ত মেয়েটার দিকে চাইল। ওর সারা চেহারায় একটা কেমন দুঃখের ছাপ মাখানো। তবু ওর নিটোল দেহে এসেছে যৌবনের সাড়া, সেটা একটু বেশীরকম উদগ্র।

—বল না? মিনু আবদারের সুরে বলে।

সুশান্তও শুনেছে ব্যাপারটা। ওই প্রভাতই যত কিছুর মূলে। ফেলুও প্রভাতের কাজটার ফল ফলতে দেখে ওকে বলেছে—জব্বর কাণ্ড করেছিস মাইরী।

কিন্তু সুশান্তর মনে হয় প্রভাত কাজটা ঠিক করে নি। এভাবে হরিশস্যারকে বঞ্চিত করাটা অন্যায় হয়েছে। মিনুর কথায় সুশান্ত বলে—আমি ঠিক জানি না!

—জানিস, বলবি না। কেয়াটাও হয়েছে মহা বদমাইশ মেয়ে। একনম্বর বেহায়া।

মিনু নিজের কথাটা বলতে চায়। শোনায়—বাবাকে দেখতে যাবি না?
সুশান্তর খুব ইচ্ছে করছিল যাবার। কিন্তু সাহস হয় না। তাই এড়িয়ে গেল সে। মিনু তবু বলে—চল না?
সুশান্ত ওর ভাইবোনগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। পরনে আধময়লা জামা প্যান্ট, হাতে গেলাস ঘটিতে ভুক্তাবশেষ সন্দেশ-মিষ্টি নিয়ে চলেছে। ওদের সঙ্গী হতে ভালো লাগে না। তাই সরে গেল। মিনু মনে মনে রেগে উঠেছে এই এড়িয়ে যাওয়ায়। তাই বলে—জানিস, বললি না তুই।
কেয়াও দেখেছে ব্যাপারটা। কেয়া সুশান্তকে চলে আসতে দেখে বলে—গেলে না কেন?
সুশান্ত এ যেন নতুন কোন্ কেয়াকে দেখছে। ওর ফর্সা রংটা লালচে হয়ে উঠেছে। সুশান্ত জানায়—ওরা ঠিক কাজ করে নি হরিশস্যারকে এমনিভাবে জব্দ করে?
কেয়া জবাব দিল না।
ও এগিয়ে গেল।
ফেলু দলবল নিয়ে ফিরছে। ওদের আজ ভোজনটা বিনা অপমানে সমাধা হয়েছে, তাই বেশ খুশী খুশী ভাব। আর প্রভাতকেই তাই খাতির করছে তারা। সুশান্তর মুখে ওই কথা শুনে ফেলুই প্রতিবাদ করে—তুই একেবারে করুণাময়, গড হয়ে উঠলি যে র‍্যা? প্রভাতও ভেবেছিল—শান্তও বাহবা দেবে তাকে। কিন্তু উলটো আলোচনা করতে দেখে বলে—তুই তো ভালো ছেলে, টপ্‌টপ্ সব জবাব দিবি। তাই হরিশস্যার না যাওয়াতে তোর খ্যাতি কিছু কমেছে।
সুশান্ত বলে—তবু অন্যায় এটা।
—রাখ তোর অন্যায়। ফেলু ধমকে ওঠে।
সুশান্ত চুপ করে গেল। ওরা তখন কান্দী শহরের এগ্‌জিবিশনের মেলা, সার্কাস, সিনেমার আলোচনায় মশগুল। কবে যাবে তারই প্ল্যান কষতে কষতে চলে গেল। প্রভাতও যেন ওদের দলে ভিড়েছে। কেয়াও তাকে

ফেলে এগিয়ে গেল।

বিকেলের ক্লান্ত রোদ এসে পড়েছে তাদের নির্জন বাড়িটার পিছনে নারকেল সুপারি গাছের মাথায়। দিঘির কালো জলে ওই আলোর ছোঁয়া, মনের অন্ধকার অতলে তবু কোথাও আলোর আভাস নেই, শুধু ভাবনার ঢেউগুলো কি বেদনার সুর তোলে। নিঃস্বতার বেদনায় ভরা বিবর্ণ সেই সুর। বার বার মনে হয় সুশান্তর, তার সব কিছু যেন ব্যর্থতা আর শূন্যতায় ভরা।

অমনি সবুজগাছের বুকে হলুদ আলোর ঝলকানি কোথাও নেই তার ভাবনার জগতে। আনমনে ছায়া অন্ধকারনামা ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে বাড়িতে ফিরছে সে।

—কি গো রাঙাবাবু! কেমন ভোজ খাওয়া হল? আবছা অন্ধকার জমে আছে এখানে। এককালে গোলাবাড়ি ছিল, এখন ধ্বংসস্তূপ। ছাদগুলো ঠাই ঠাই টিকে আছে।

এখানে বাতাসে মাঝে মাঝে টকটক গন্ধ ওঠে। রাতের অন্ধকারেও নাকি দু'একজনকে এখানে দেখা যায়, অবশ্য প্রভাতই বলেছে তাকে এসব কথা। তারা কারা আর কেনই বা আসে তা ঠিক জানে না সে। প্রভাত অবশ্য দু'একটা কথা বলেছে। এখানে ওই ভাঙা বাড়িগুলোর মধ্যে কারা নাকি মদ চোলাই করে। বাতাসে তাই এমনি টকটক গন্ধ উঠছে।

ওকে দেখে এগিয়ে আসে পটল। তাদের, তরফের কাকীমার মহলের ঝি। বয়স বেশী নয়—বেশ গোলগাল দেখতে। দিন রাত পানের রসে ঠোঁট দুটো রাঙানো, আর সেজেগুজেই থাকে। ওকে বাড়ির অন্য ঝি-রা দেখতে পারে না।

সুশান্তর ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আজ ওই পটলকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখে দাঁড়াল সুশান্ত। জবাব দেয়—ভালোই।

সুশান্ত ওকে দেখছে। কি ভেবে ওই থমথমে বিশ্রী গন্ধভরা জগৎ থেকে

সরে আসতে চায়। তাই চলে এল সে। একটু আসার পরই সুশান্ত পেছনে ওই ধ্বংসস্তূপের আড়ালে কার হাসির ধারালো শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। ওদিকে আর দেখা যায় না—ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ওরা ঢাকা পড়ে গেছে। কে বলছে—কাঁচা মাথাটা আবার চিবুবি নাকি পটলী?

পটল হাসছে খিলখিলিয়ে। বললো সে—অক্তের দোষ যাবে কুথায় গ! এখন থেকেই ছোড়ার চাউনি দেখছিলাম, কেমন খাই খাই ভাব গ!

সুশান্ত চমকে ওঠে। ঠিক ওই কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তার মনে হয় কেমন একটা বিশ্রী ইঙ্গিতই করছে ওই মেয়েটা। ভয় করে তার।

ওদের হাসির শব্দ ওঠে।

সুশান্ত সচকিত হয়ে একটু জোরে জোরে পা ফেলে বৈকালের ছায়া-নামা উঠানে এসে পড়ল। কাছারিবাড়িটা নির্জন। পায়রাগুলো বকবকম শব্দ করছে। সুশান্তর মনে হয় ওই মেয়েটা যেন বিশ্রী কি একটা গালা-গাল দিয়েছে। কাউকে বলাও যায় না। চুপ করে কি ভাবছে সে। বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

আজ বৈকালে খেলতে যেতেও মন চায় না। প্রভাত-কেয়াও তাকে আজ এড়িয়ে গেছে। মিলুদিও নেই। কাকীমা ওকে বাড়ি ফিরতে দেখে চাইল। কাকীমা বোধহয় এককালে খুবই সুন্দরী ছিল। এ বাড়ির বৌ গিন্নীদের বোধহয় সুন্দর দেখেই আনা হয়। কিন্তু এ বাড়ির আকাশে বাতাসে কি যেন হাহাকার মিশিয়ে আছে। কাকীমাকেও দেখেছে তাই মনমরা হয়ে থাকতে। একটা দুঃখকে ওরা চেপে থাকে। কাকামণিও বাইরের কাছারি বাড়ির লাগোয়া খাস কামরায় অনেক রাতেই থাকেন। কাদের জড়িত কণ্ঠের হাসির শব্দও ভেসে আসে রাতের অন্ধকারে।

এ বাড়ির ধ্বংসপুরীতে ওঠে বুক চাপা অসহায় কান্নার রেশ। চমকে ওঠে সুশান্ত। ঠিক কারণটা জানে না সে, তবে সেই শূন্যতাটাকে দেখেছে সে বার বার।

—ফিরে এলি, এতো দেরী হল? কাকীমা ওকে শুধোল। কাকীমার দিকে

চেয়ে থাকে সুশান্ত। বৈকাল হয়ে আসছে। ছাদের মাথায় শীতের রোদ হলুদ হয়ে ওঠে। কোথায় উদাসপুরে পাখী ডাকছে। জবাব দিল সুশান্ত —এমনিই!

ছাদের দিকে উঠে গেল সে। খুড়তুতো ভাই শমীক এবং আরও কে ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আজ বাইরে যেতে তার মন চায় না। ছাদের একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখান থেকে চারিদিকে নজর যায়। ঘর বাড়ি শিবমন্দির ওই ডাকঘরের বাড়িটার ওদিকে মোল্লাপাড়ার ছোট ছোট ঘরগুলো গড়ে উঠেছে পুকুর-টাকে কেন্দ্র করে। তারই ওপারে সবুজ ধানক্ষেত, সেখানে এখন সোনা-হলুদের আভা জমেছে। তার ওপাশেই ময়ূরাক্ষীর বিস্তীর্ণ রূপালী বালু-চর। ওর বুক এখন শূন্য রিক্ত। একটা জলরেখা বয়ে চলেছে ক্ষীণধারায়। বর্ষার শুরু থেকেই ওখানে ঢল নামে, গেরুয়া ঢল। নদীর কলগর্জন শোনা যায় এখান থেকেই। এখন সেই গর্জন আর নেই। ওপারে বিস্তীর্ণ সবুজের বুকে গ্রামগুলো জেগে আছে। সুশান্তর মনে হয় এই বিরাট পৃথিবীর মাঝে সেও নিঃসঙ্গ একা।

শমীক চিৎকার করে ওঠে, মুখপোড়া হুয়ো—হুয়ো। ওদিকে আর একটা ঘুড়ি উড়ছে। সেটাকে কিছুতেই প্যাঁচ দেবার জন্য নাগালের মধ্যে পাচ্ছে না দেখে চিৎকার করছে সে।

ওকে দেখে অবাক্ হয় সুশান্ত। সিগ্রেট টানছে শমীক। সুশান্ত বলে—ওকি রে?

শমীক হাসছে, বলে—কেন সিগ্রেট! আজ খাওয়াটা জোর হয়ে গেছে, তাই পানের সঙ্গে সিগ্রেট ধরালাম। তুইও একটা খা না, দেখবি সব হজম হয়ে যাবে।

শমীক তার সমবয়সীই। তাকে সিগ্রেট খেতে দেখে অবাক্ হয়েছে সে। শমীক পড়াশোনাতেও তেমনি। কোনো কোনো ক্লাসে দুবছরও গড়ান দিয়েছে। শমীক ওকে সিগ্রেট দিতে আসে। সুশান্ত ওসব খায় না। বলে

সে—না।

শমীক ওর মুখের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে অবজ্ঞা ভরে বলে—তুই তো আবার গুড বয়। দেখিস বাবাকে যেন বলিস না। কতো লোকে এর চেয়ে কতো বড় নেশা করে। আমি তো বাবা "ওন্‌লি স্মোকিং", নাথিং বং!

শমীক আবার ঘুড়ির সুতোয় টান দিতে থাকে।

সুশান্ত জানে শমীক তার তুলনায় অনেক বাবু, তাছাড়া ওর সঙ্গী সাথীরাও অন্য ধরনের। কিন্তু শমীক যে এতখানি এগিয়েছে তা জানতো না।

বসন্তনারায়ণ চৌধুরী এখন ছোট তরফের ধ্বসেপড়া মহলকে যেন পাহারা দিয়ে রেখেছে। সবই প্রায় গেছে। সামান্য কিছু মহাল আর প্রজাপাটক ওই দেব সেবার দোহাই দিয়ে টিকে আছে। তাও নাকি যাবার উপক্রম হচ্ছে স্বাধীন হবার পর।

কিন্তু বড় ভাই নরেন্দ্রনারায়ণ এ বংশের এখন কৃতি লোক। কোন্ সাহেব কোম্পানির সুগার মিলের একজন হোমরা-চোমরা হয়ে আছেন। তিনিও মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠান, ওই ছেলেমেয়েদের জন্য। তবু কিন্তু বসন্তনারায়ণের দাপট কমে নি। শূন্য পাত্রের মতোই তাতে আওয়াজ ওঠে বেশী। শাসনের কঠিন বাধনে সব কিছুকেই বেঁধে রাখতে চান তিনি।

অবশ্য নিজের বেলায় সেটার কড়াকড়ির প্রয়োজন নেই। সেখানে নীল রক্তের কুৎসিত প্রকাশগুলোকে শুধু সঙ্গোপনে রাখেন মাত্র।

এই নিয়ে মাধুরীর সঙ্গেও বাধে। অবশ্য মাধুরী খুবই সংযত আর স্বল্পবাক্। চুপ করে এই ধ্বসেপড়া বাড়ির পরিবেশে বন্দী হয়ে আছে আর দেখছে ওদের লোভী কদর্য মনের প্রকৃত স্বরূপটাকে। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো প্রতিবাদ করতে তার নিজেরই সম্মানে বাধে। তাই সেই যন্ত্রণাটাকে চেপে রেখেছে মনের অতলে। সেটা বন্দী ঘূর্ণীপোকার মতো কুরে কুরে খায় তার সারা অন্তর। তবু প্রতিবাদ করতে পারে নি।

বাতাসে ওই গোলাবাড়ির জঙ্গল থেকে টকটক গন্ধ ভেসে আসে, অন্ধকারে কাদের ধারালো হাসির শব্দটা নৈশ অন্ধকারকে ছুরির ফলা দিয়ে যেন চিরে খান্ খান্ করে দেয়।

মাধুরীর ঘুম আসে না। জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে তারাজ্বলা আঁধার ওই আকাশ আর ধ্বংসপুরীর দিকে।

অনেক পাপের ইতিহাস এখানে জড়ো হয়ে আছে। বসন্তনারায়ণ এখনও ফেরে নি। কাছারিবাড়িতে কি একটা জরুরী কাজ আছে। বহু বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে মাধুরীর। রাত্রি শেষে ও ফেরে অন্য রূপে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে। তবু প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারে না।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। তাছাড়া বড় ভাসুরের ছেলে সুশান্ত, মেয়ে মিলি আছে। তাদের সামনেও মাধুরী সার্থক কোনো গৃহিণীর অভিনয় করেছে। দেখেছে ওই বসন্তবাবুও আবার দিনের আলোয় দিব্যি মুখোস পরে কঠিন শাসনকর্তা আর নীতিবাগীশ হয়ে পঞ্চায়েত বোর্ডে বসে আইন, ন্যায়নীতির ধারক বাহক হয়ে উঠেছে।

বড় মায়ের কথা মনে পড়ে।

এ বাড়ির সেই ছিল শ্রীময়ী কুলবধূ। তখন সুশান্ত অনেক ছোট, মিলি সবে কোলে এসেছে। মাধুরী দেখেছিল সেই স্নেহময়ী মেয়েটিকে। তার কথাগুলো মনে পড়ে।

—এ বাড়িতে এলি, বাইরে যা দেখছিস এর আড়ালে এই বাড়ির কান্নাটাকেও দেখবি মাধুরী। এখানে দিন রাতের রূপ আলাদা। সবই সইতে হবে।

মাধুরী সেদিন তার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারে নি। বড়দি এ বাড়িতেই থাকতেন; আর স্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ থাকতেন দূরের সেই চিনির কলের ছোট সাহেব হয়ে। এ বাড়ির বৌদের নাকি বাড়ির বাইরে গিয়ে তেরাত্রির বেশী থাকার কানুন নেই।

…এইখানেই যেন বন্দীদশায় ফুরিয়ে গিয়েছিল বড়দি। তখন এই সুশান্ত

অনেক ছোট, আর মিলি সবে হাঁটতে শিখেছে।

…পিঠে-পিঠি ভাই বোন। শমীকও এসেছে তার কোলে। তিনটি ছেলে-মেয়েকে তখন থেকেই মানুষ করছে মাধুরী। এই নিয়েই তার জগৎ। এদের নিয়েই চারিদিকের সব বঞ্চনাকে ভোলবার চেষ্টা করেছে সে। সব মিথ্যেকে সহনীয় করে তুলেছে। অন্ধকারে কোথায় একটা পেঁচা ডাকছে। প্রহর ঘোষণা করছে ওই প্রাণীটা। এ বাড়ির ধ্বসেপড়া জঙ্গলে কোথায় শেয়াল ডেকে ওঠে।

মনে হয় এই ধ্বংসপুরীর মানুষগুলোর জীবনে ওরা অমারাত্রির ইঙ্গিত আনে। এককালে হয়তো এদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল, সমৃদ্ধি ছিল।

এখনও এরা সেই জীর্ণ সম্পদকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, কিন্তু ওরা জানে না ওদের সব ফুরিয়ে আসছে।

মাধুরীও চায় এই নিঃস্বতার মাঝে প্রতাপ নিয়ে বেঁচে থাকার অমারাত্রি এদের ফুরিয়ে যাক। আর সেও মুক্তি চায় এই কারাগার থেকে।

বড়দির কথা মনে পড়ে। বড়দিও বলেছিল—এই যমপুরী থেকে মুক্তি পাবি না মাধু। এরা নিজেরাও মরবে, আমাদেরও মারবে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠি। এই পাপপুরী থেকে ওরা যদি বাইরে যেতে পারে বাঁচবে।

মাধুরী রাত্রি নিশীথে এমনি হতাশার আঁধারে হারিয়ে যায়, হয়তো নতুন জগতের স্বপ্ন দেখে। পায়ের শব্দে চমকে ওঠে। টর্চের আলোটা অন্ধকার সিঁড়িতে পড়েছে। ভারী গলার শব্দ ওঠে—ছোট বৌ!

মাধুরী চুপ করে এগিয়ে গেল। বসন্তনারায়ণ ঢুকছে। বাহান্ন ইঞ্চি ধুতি লোটাচ্ছে, পাঞ্জাবিতে পানের কষের দাগ, কোনো রকমে এসে বিছানায় পড়ল।

রাতের পঙ্কিল জীবনটা মাধুরীর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছে। এমনি গোপন অন্ধকার রাত্রিগুলো তার কাছে বহু ঘৃণার আর আতঙ্কের রাত্রিতে পরিণত হয়েছে।

হরিশমাস্টারের মেয়ে মিনতিও কথাটা শুনেছে। তাছাড়া ওই সুশান্তকেই তার সন্দেহ হয়। শুনেছে শমীকের কাছে সুশান্তর কথা। ওরা নাকি শমী-কের বাবার দয়ায় ওই বড় বাড়িতে রয়েছে। ওর মাও নেই বাবাও নাকি কোন্ সাহেবী বাংলোয় পড়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধও নেই। শমীকই তাকে এই সব কথা বলেছে।

তবু মিনতি আজ বড় মুখ করে সুশান্তকে ডেকেছিল। শমীক নিজে থেকেই কতো দিন তাদের এই গলির মধ্যকার নির্জন ছায়াঘেরা বাড়িতেএসেছে। মিনতিই তাকে এড়িয়ে গেছে। শমীকটা কেমন বুনো গোছের। তার চেয়ে সুশান্ত অনেক সুন্দর দেখতে। তাছাড়া কেয়ার সঙ্গে ওর ভাবও দেখছে। মিনতি কেয়াকে মনে মনে হিংসা করে। তাই কেয়াকে দেখাতে চেয়েছিল সুশান্তকে সে অনায়াসে ওর কাছ থেকে সরিয়ে নিতেপারে। কিন্তু মিনতি হতাশ হয়েছে। সুশান্ত তার ডাকে সাড়া দেয় নি, সরে গেছে।

মিনতি রাগে জ্বলে উঠেছে। ছোট ভাইবোনগুলোকে তাড়া দেয়—চল তোরা

নিজের ঢল নামা পুরুষ্ট দেহটাকে সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করে৷ সেই সুন্দর দেহটার দিকেও সুশান্তর কোনো দৃষ্টি নেই। এই অপমানটা তার কাছে বড় হয়ে ঠেকেছে।

হরিশমাস্টার ততক্ষণে দু' একটা বড়ি কড়ি গিলে একটু সামলে নিয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় অধিকারী বাড়ির ব্রাহ্মণ ভোজন সারা হয়েছে। এত বড় ভোজটা হাত ফসকে বের হয়ে গেল। গিন্নী বলে—একটু বার্লি দোব ?

হরিশ পণ্ডিত খাইয়ে লোক। আজ যেন গিন্নীও তার সঙ্গে রসিকতা করছে এই ভেবে ফুঁসিয়ে ওঠে—ছাই দাও না। তাই ভালো।

এমন সময় মেয়েদের ফিরতে দেখে হরিশমাস্টার হকচকিয়ে ওঠে। ওদের হাতে সেই গেলাস ঘটিতে কিছু সন্দেশ ছানাবড়াও রয়েছে। হরিশ পণ্ডিত শুধায় —কেমন ভোজ হল র‍্যা ?

ওরাও খুব খুশী হয়ে শোনায়—মাছ, সন্দেশ, লেডিক্যানি যা চাই ; আর

দই যা করেছিল বাবা, ক্ষীর, কালাকান্দ।

পুত্রশোকে যেন মুহ্যমান হয়ে পড়ে হরিশ পণ্ডিত। হঠাৎ মিনতিকে ঢুকতে দেখে চাইল। মেয়েটা এর মধ্যেই হাঁপালো হয়ে উঠেছে। গিন্নীও তাগিদ দেয় পাত্রটাত্র দেখবার জন্য। কিন্তু হরিশ পণ্ডিতের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাই চেষ্টা করছে সে কোনো রকমে ফ্রিতে পাস করালে যা হোক একটা কাজ কম্ম জুটিয়ে দেবে। তবু সংসারের সুরাহা হবে। গিন্নী মেয়েকে একলা ফিরতে দেখে খিঁচিয়ে ওঠে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ!

মিনতি জানায়—সেইটাই বলছি। বুঝলে বাবা, ওই প্রভাত আর সুশান্ত দুজনে জানে তুমি যেতে পারবে না। ওদের কি খুশী খুশী ভাব।

প্রভাত আর সুশান্তকে হরিশমাস্টার দেখেছে একসঙ্গে ঘুরতে। সুশান্ত সায়েন্স নিয়ে এবার ক্লাস টেনে উঠেছে।

মিনতি বলে—প্রভাতই আজ খেজুর রস দিয়ে গিয়েছিল সকালে। তাতেই কে জানে ওই শান্তর কথায়—

চমকে ওঠে হরিশমাস্টার। আজ সকালে প্রভাতই একটা পাত্র করে খেজুর রস দিয়েছিল তাদের গাছের। জিরেন কাটের রস। হঠাৎ এতদিন পর খাতির করে আজই রস খাওয়াতে আসার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারে।

বোধহয় ওইতেই কিছু কৌশল করেছিল। মিনতি শোনায়—কাল নাকি ওরা বিমলবাবুর ডাক্তারখানা থেকে কি জোলাপ এনেছিল। ওই শমীকই তো বললে!

মিনতি সব কথাগুলো কিন্তু সত্যি বলে নি। ওই কাজটা প্রভাতই হয়তো করেছে। ইচ্ছা করেই সে সুশান্তর নামটা জড়িয়ে দিয়েছে তাকে একটু শাস্তি দেবার জন্যই। আর এটা করেছে মিনতি নেহাত রাগের বশেই।

হরিশমাস্টার তখনই গর্জন করে ওঠে—এ্যাঁ! এত বড় শয়তান ওরা! মানুষ মেরে ফেলতেও পারে। একেবারে মুক্ত কচ্ছ অবস্থায় ঠেলে উঠেছে সে।

গিন্নি হকচকিয়ে ওঠে—কোথায় চললে?

হরিশমাস্টার তখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। দড়ির আলনা থেকে ফতুয়াটা টেনে গায়ে চাপাতে চাপাতে বলে—ওর বিহিত করে আসছি। এঁ্যা—মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে ওরা। চুপ করে থাকব?

সামনে পেলে বোধহয় তখনখুনই করে ফেলবে হরিশমাস্টার। তা না পেয়ে এগিয়ে চলে ওই কাছারিবাড়ির দিকে। পথে একবার ওই শশধরের বাড়ি-টাও দেখে যাবে, প্রভাতটাকে যদি পায়।

গিন্নি তখনও পিছু ডাকছে—এখুনিই নাই বা গেলে? পরে যাবে।

মিনতি খুশী হয়েছে। এর একটা বিহিত হোক। তাই বাধা দেয় সে—যাচ্ছে যাক না। ছিঃ ছিঃ এইসব কাণ্ড!

বসন্তনারায়ণ তখন বৈকালের আসর জমিয়েছেন কাছারিবাড়ির বৈঠক-খানায়। নরেন দত্ত, শীতলবাবু আরও অনেক আছে। স্কুলের হেডমাস্টার নলিনীবাবুও এসেছেন সেক্রেটারীবাবুকে খুশী করতে। পান তামাক চলছে। হঠাৎ এমনি সময় হরিশমাস্টারকে দেখে চাইলেন বসন্তবাবু—কি ব্যাপার? শুনলাম শরীর খারাপ, কেমন আছেন?

হরিশ পণ্ডিত আর্তনাদ করে ওঠে—খুন করে ফেলতে চেয়েছিল ওই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র—মানে সুশান্ত। একমাত্র পুণ্যের জোরে বেঁচে গেছি চৌধুরীমশায়। ওরা নরঘাতক—

চমকে ওঠে সকলেই—কি ব্যাপার?

হরিশমাস্টার তৎক্ষণে কান্নাবিজড়িত গলায় সালংকারে ওদের সেই পরি-কল্পনার কথা বলে চলেছে। বসন্তনারায়ণ রেগে উঠেছে। সুশান্ত যে এমনি কাজ করতে পারে তা ভাবেন নি।

হরিশমাস্টার বলে—অতীব কুসংসর্গে পতিত হয়েছে, চৌধুরীমশায়।

বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন—অ্যাই ভীমে, শান্তবাবুকে ডেকে আন। আর দুটো খেজুর ছড়ি কেটে দিয়ে যা।

সুশান্ত জানে না কি অপরাধ। তাকে ভীম ওই ছাদ থেকে ডেকে এনেছে

এই কাছারিবাড়িতে। হরিশমাস্টার তখনও চিৎকার করছে—অ্যাই যে। প্রাণে মেরে কি হতো বাপধন ?
সুশান্ত কিছু বোঝবার আগেই বসন্তনারায়ণ ওর কান ধরে ওদের সকলের সামনে সেই ছড়ি দিয়ে পিঠেই কয়েক ঘা বসিয়ে দেয়।
চমকে ওঠে সুশান্ত—কি করেছি আমি।
—জানিস না ? বসন্তবাবু গর্জাচ্ছেন—জমিদারী মেজাজ নিয়ে। এমন চাবুক তাঁরা প্রায়ই চালান ! কিন্তু শান্ত বুঝতে পারে না এক্ষেত্রে তাকে এভাবে অপমান করার কি অর্থ থাকতে পারে।
হরিশমাস্টারকে বিষ দিয়েছিলি ?
জবাব দিল না সুশান্ত। এসবের সে কিছুই জানে না, পরে শুনেছিল মাত্র। কিন্তু তাই নিয়ে ওই পণ্ডিতকে এখানে এসে নালিশ করতে দেখে অবাক্ হয়েছে। তার পিঠে তখন আরও কয়েক ঘা বেত পড়েছে। সারা শরীরে একটা তীব্র জ্বালা, ওর মনে হয় তাকে এতবড় অপমান কেউ করে নি। মনের নিঃসঙ্গতাটা আজ কাঠিন্যে পরিণত হয়।
গর্জে ওঠেন বসন্তবাবু—কেন করেছিলি এ সব ?
জবাব দেয় না সুশান্ত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ধরে ওই শক্ত হাতের চাবুকের প্রতিটি ঘা সে সহ্য করছে। সারা শরীরে জ্বালাকর দুঃসহ একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে, চেতনা-শক্তি স্তিমিত হয়ে আসে। দূর থেকে সে যেন কার গর্জন শুনছে—জবাব দে !
কোনো জবাবই সে দেবে না।
শমীক, বিলু, মিলি ওরা সকলেই এসেছে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কে যেন বলে—এবার ছেড়ে দিন ছোটবাবু !
বসন্তনারায়ণ দাপটের সঙ্গে গর্জন করছেন—শায়েস্তা করে ছেড়ে দেব। আমার কাছে কোনো অন্যায়ের ক্ষমা নেই নরেন।
বসন্তনারায়ণ ন্যায়নীতির ধারক হয়ে উঠেছেন। কোনোরকমে টলতে টলতে বের হয়ে এল সুশান্ত। কোনোমতে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় এসে বসল।

মারের বেদনা তার সারা শরীরকে যেন ভেঙে মুচড়ে দিয়েছে। তার চেয়েও বেশী বেজেছে ওই আঘাতটা তার মনের গভীরে। তবু চোখ দিয়ে জল বের হয় নি। চোখের সামনে দেখেছে সুশান্ত—ওই কাকামণি, হেডমাস্টার মহাশয়, হরিশমাস্টার আরও সকলকে। ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করেই ওরা তাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছে আর নির্মমভাবে শাস্তি দিয়েছে। সবকিছুই ওদের মিথ্যা। এই নির্মম শাস্তি দেবার কি অধিকার তাদের আছে জানে না—তবু দিয়েছে তারা।

—কি করেছিলি শান্ত ?

কাকীমাকে এখানে দেখে চমকে ওঠে সুশান্ত। কাকীমার দুচোখে কি বেদনার ছায়া। সুশান্ত ওর দিকে চাইল। মনে হয় এখানে কোনো কৃত্রিমতা নেই। তাই জানায় সে—কিছু করি নি আমি। কে নাকি হরিশমাস্টারকে জোলাপ দিয়েছিল।

কাকীমা ওর দিকে চেয়ে থাকে। ঘৃণাভরা কণ্ঠে শোনায় কাকীমা—তাই তোকে এমনি করে মারল ?

কাকীমা বলে ওঠে শ্যামা ঝিকে, ওর হাতে দশ টাকার নোট একখানা দিয়ে, বাজার থেকে দু'সের মিষ্টি কিনে ওই পেটুক হরিশ পণ্ডিতের বাড়িতে দিয়ে আয় শ্যামা। বলবি আমি পাঠিয়েছি। আর ওকে—

কি ভেবে কাকীমা থামল। সুশান্ত চুপ করে বসে আছে।

রাতের অন্ধকার নামছে। সারা দেহ মনে কি দুর্বার জ্বালা ফুটে উঠেছে। আজ মনে হয় সত্যিই সে একা। মায়ের কথা মনে পড়ে। ডাগর দুটো চোখ তার দিকে কি শান্ত চাহনি মেলে চেয়ে আছে। সব ছাপিয়ে ওঠে কাকার সেই তর্জন-গর্জনের সুর, যেন একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে তার উপর লাফ দিয়ে পড়ে ধারালো দাঁত নখ দিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চায়।···দু'এক জায়গায় কেটে গেছে, জ্বালা করছে। একান্ত নির্জনে বুক ঠেলে একটা দুঃসহ বেদনা গুমরে ওঠে। কোথায় নিঃস্ব রুক্ষ প্রান্তরে হারিয়ে গেছে সে, বুকভরা শুধু তৃষ্ণা। কোথাও এতটুকু পানীয়ের আশ্বাস

নেই। পাগুলো টেনে টেনে ধরছে, চলবার সাধ্য তার নেই। একা এমনি কোনো মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে সে।

…হঠাৎ কার একটু ছোঁয়ায় শান্তর অনুভূতি ফিরে আসে। জ্বালাটা কমে কমে আসছে ওই স্পর্শে। নরম শীতল একটু স্পর্শ। চমকে উঠে চাইল চোখ মেলে।

ঘরের ম্লান একটু আলোয় দেখা যায় একটা সুন্দর মুখ ডাগর কালো চোখে জল টল টল করছে। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ওকে এখানে দেখে চমকে ওঠে সুশান্ত। কেয়া এখানে আসবে তা ভাবে নি।

কথা বলতে গিয়েও পারে না সুশান্ত। চেয়ে রইলো ওর দিকে। কেয়া শুনেছে ব্যাপারটা।

হরিশমাস্টার যে ওখানে এসে নালিশ করেছে সে খবর তখুনিই ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাতও শুনেছে কথাটা। মনে হয়েছে প্রভাতের, এইবার তার সব জারিজুরিই ফাঁস হয়ে যাবে এবং তার পিঠেও দু'একটা বেত ভাঙবে। ছেলের দলও খবর পেয়ে অধীর আগ্রহ নিয়ে কাছারিবাড়ির আশপাশে এসে জমেছে। প্রভাতও রয়েছে দূরে দূরে সঙ্গোপনে। তারা শিউরে উঠেছে সুশান্তকে অমনি ভাবে মারতে দেখে। সুশান্ত কোনো জবাব দেয় নি। চুপ করে মার খেয়েছে আর সব দোষই নিজের ঘাড়ে টেনে নিয়েছে।

ফেলু গজরাচ্ছে—দেব এইবার হরিশমাস্টারের ঠ্যাঙ খোঁড়া করে।

শ্যামল শোনায়—বুঝলি প্রভাত, শান্ত রিয়েলি তোর বন্ধু। তোকে বাঁচিয়ে দিলে স্রেফ!

শান্তকে বোধহয় খুবই মেরেছে ওর কাকা। কেমন টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে গেল সে। হরিশমাস্টার তখনও আপসাচ্ছে—কি ডেঞ্জারাস্ ছেলে মশাই! মোস্ট আন্‌রিলায়েবল্।

প্রভাত দেখেছে ব্যাপারটা। মিনতিও এসেছিল বাবার পিছু পিছু। সেও মনে মনে খুব খুশী হয়েছে ওই নির্দয় প্রহার দেখে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

ছায়া অন্ধকার ঘেরা জায়গা দিয়ে ফিরে আসছে মিনতি, হঠাৎ শমীককে দেখে দাঁড়াল। জায়গাটা আবছা অন্ধকারে ভরা। বড় বড় বাড়িগুলোর দেওয়াল খসে খসে পড়েছে, পথের ধারে গজিয়েছে কালকাসিন্দে, পিটুলি গাছের জঙ্গলগুলো। কেমন ধ্বসে পড়া হারিয়ে যাওয়া এই পরিবেশে মিনতি শমীককে দেখে দাঁড়াল।

শমীকও মনে মনে খুশী হয়েছে। সুশান্তর সম্বন্ধে মায়ের ধারণা অন্যরকম। কথায় কথায় মা ওর সঙ্গে তার তুলনা দেয়। বলে—কতো ভালো ছেলে সুশান্ত। আর তুই! গাধা—যা তা সব বদঅভ্যাস জুটিয়েছিস।

সেই সুশান্তও যে কত বড় শয়তান আজ সেই কথাটাই যেন মায়ের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সেই সুযোগ করে দিয়েছে মিনতি।

আলো-আঁধারির মাঝে শমীক ওর দিকে চাইল। মিনতির নিটোল দেহের দিকে কি বুভুক্ষু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শমীক। ও জানে মেয়েটা তার জন্যই এখানে এদিকে এসেছে।

মিনতি বললে—সুশান্তটা খুব বেড়েছিল। উঃ, কি শয়তান জান? বাবাকে ওরা নাকি জব্দ করেছে এই ভাবে। এখন, উল্‌টে কেমন জব্দ হয়ে গেলি তুই!

শমীক ওকে দেখেছে। ময়লা একটা শাড়ি পরেছে। ওর দেহের রেখাগুলো সবে ফুটে উঠছে। শমীক এর মধ্যেই অন্ধকারের একটা বিচিত্র জীবনের নেশার সন্ধান পেয়েছে। ওর দেহের কোষে কোষে তাই একটা বিচিত্র চাঞ্চল্য জাগে।

ফেলুর কাছেই শুনেছে নানা কথা। কিন্তু ভয় করে শমীকের। মিনতি ওর কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। ওকে দেখছে। শমীকের চোখে নেশা লাগে। ও শুধোল—তুই আমাকে ভালোবাসিস মিনতি?

মিনতি ওই শমীকের দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখে মুখে কি বিচিত্র একটা সাড়া জাগে। এখন থেকেই মিনতি একটা নেশা লাগানো ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। জানে শমীককে হাতে রাখা তার দরকার। এই-

টুকু তার কাছে অনেক পাওয়ার ইশারা আনে। ওর তুলনায় ফেলু একটা অপদার্থ।

বাজে বিশ্রী ছেলেটা এখন থেকেই তাকে জ্বালাতন করে দু'একটা বিশ্রী চিঠি লিখেছে। পথে ঘাটে দাঁড়িয়ে কি সব ইশারা করে। মিনু তাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। তবু চটায় নি তাকে। মনে হয়েছে মিনতির এ যেন একটা খেলা। এই খেলার নেশায় সেও মেতে উঠেছে। সে চায় সকলেই তার আশেপাশে ঘুরুক, আর সকলকে সে খেলিয়ে চলবে।

শমীকের চোখে মুখে সেই নীরব ক্ষুধাটাই দেখেছে ধূর্ত মেয়েটা। ও যেন জালে বদ্ধ মাছ, তাকে এইবার গুছিয়ে তুলতে হবে। মিনতির চোখের পাতায় কি রহস্য জমে। ও হাসছে।

—ধ্যাৎ! কি বাজে কথা বল তুমি শমীকদা!

পাতলা ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে ধূর্ত মেয়েটা অভিনয় করে চলে—আমার বিশ্রী লাগে কিন্তু!

শমীক যেন দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এই নীরব নির্জন পরিবেশে সে আরও সাহসী হয়ে উঠে ডাকে—মিনু!

ভালোবাসার ছোঁয়ায় গদ-গদ হয়ে ওঠে শমীক। মেয়েটা ওর হাত ছাড়িয়ে নিলো না। বরং আরও কাছে এগিয়ে আসে। শমীকের গায়ে ওর নরম নিটোল দেহের উত্তপ্ত ছোঁয়া লাগে। ছেলেটা চমকে উঠেছে। এতদিন ধরে এইটুকুর স্বপ্ন দেখেছিল সে, আজ সেই স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে।

মেয়েটাও চকিতের মধ্যে যেন বাঘিনীর মতো রক্তলোলুপ আর আদিম হয়ে উঠেছে। নিজেই দুহাত দিয়ে ওকে কাছে টেনে নেয়। ধ্বংসপুরীর আলো-আঁধারির অতল থেকে অতীতের কিছু যেন জেগে উঠেছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তার লুব্ধ দীর্ঘশ্বাস।

কেয়া সরু পথটা দিয়ে চলেছে। ও হঠাৎ চমকে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে ওদের ছায়ামূর্তি দুটো চোখে পড়ে। কি এক অজানা ভয় আর লজ্জায় শিউরে ওঠে সে।

দৌড়ে পালাল ওই বড় বাড়িটার ভিতর দিকে। এখানে দাঁড়াতে সাহস নেই তার।

সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে, ওর সদ্যজাগর কিশোরী মন অজানা ভয়ে শিউরে উঠেছে। কি যেন একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে থাকে এই বিরাট ধ্বসে পড়া বাড়ির কোণে কোণে।

আচ্ছা আলোভরা এই ঘরটায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। কেউ নেই। ম্লান আলোভরা ঘরের ওপাশের বিছানায় দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে সুশান্ত। পিঠটা কেটে গেছে। দেখেছে সে সুশান্তকে, মুখ বুজে সেই কঠিন অত্যাচার সহ্য করতে। তবু বলে নি যে প্রভাত ওই কাজ করেছে। বন্ধুর জন্য সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছে শান্ত—এটা আর কেউ জানুক না জানুক, কেয়া জানে।

সুশান্তর উপর সেই কারণেও খানিকটা আস্থা আর সহানুভূতি তার বেড়ে গেছে। কেউ নেই ওর পাশে। ওর মা নেই বাবাও অনেক দূরে। নিঃসঙ্গ একক ওই সুশান্তর জন্য কেয়ার মন কি বেদনায় ভরে ওঠে।

এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ ওকে ফিরে চাইতে দেখে কেয়া চমকে ওঠে। সুন্দর মুখখানা নীল হয়ে গেছে বেদনায়। চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। ডাগর দুচোখে কেমন শূন্য বেদনাভরা ক্লান্ত চাহনি।

—শান্ত!

সুশান্ত ওর দিকে চাইল। একটু আগেই ওরা তাকে ফেলে চলে গেছল। সেই কেয়াই আবার এসেছে তাকে দেখতে।

কেয়া শুধায়—খুব মেরেছে তোমাকে না?

সুশান্ত জবাব দিল না। মনে মনে কঠিন হয়ে উঠে সে শোনায়—তোরা তো খুশী হয়েছিস?

—কেন? কেন খুশী হব। কেয়া আর্তনাদ করে ওঠে। সুশান্তকে আজ একটু আগেই সে অবজ্ঞাভরে চলে গিয়ে হয়তো আঘাতই দিয়েছিল।

কেয়া বলে—কেন চুপ করে সব সইলে? মুখ ফুটে বলতে পারতে কে

করেছে এ কাজ।

কেয়ার কথায় জবাব দিল না সুশান্ত। ওদের উপর রাগ আর অভিমান বলেই বোধহয় সেই কথাটা জানায়নি। আরও জানায়নি কারণ কাকামণির ওই শাসনকে সে আজ আগ্রহ্য করতে চেয়েছে। বেশ বুঝেছে ওদের সব-কিছুই মূল্যহীন। তাই সবকথা বলেনি আর তাচ্ছিল্যভরেই।

ওটা কেয়াকেও জানাতে চায় না সে। কেয়ার ছুচোখে জল নেমেছে ওর কথায়।

কেয়া বললে—এ কথা তুমি বললে ?

সুশান্ত জবাব দিল না। আজ কারও উপর তার মায়া নমতা বিশ্বাস নেই: সব ফুরিয়ে গেছে। তাই মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল। কেয়া বোধহয় কাঁদছে। সুশান্ত কি ভেবে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে চাইতে গিয়ে দেখে কেয়া কখন চুপিসাড়ে বের হয়ে গেছে ঘর থেকে।

কেয়া বাড়ির দিকে ফিরছে। সন্ধ্যা নেমেছে—আঁধার জড়ানো সন্ধ্যা। কেয়া ভয়ে ভয়ে ওই ধ্বংসপুরী থেকে বের হয়ে এল। রেগে উঠেছে সে ওদের সকলের উপর। চেষ্টা করেও সে সুশান্তর উপর রাগ করতে পারে না। নির্দয়ভাবে মেরেছে ওকে কাকামণি, যা তা বলেছে।

বাড়ি ঢোকার মুখে কেয়া দাদাকে দেখেও দাঁড়াল না। দাদার উপরই রাগ হয়। ওর জন্মই আজ মার খেয়েছে সুশান্ত।

—কেমন আছে রে শান্ত ? প্রভাত ওকে শুধালো।

কেয়া জবাব দেয়—গিয়ে দেখে আয় না? তোর জন্য। এমনি মার খেয়েছে।

—আর কিছু বলেছে ওই হরিশমাস্টারকে ? বুঝলি একটুন্ ম্যাগ্‌সালফ্ দিয়েছিলাম ওই রসে। তাইতো বুড়োর ধাত ছেড়ে যাবে জানতাম না। তা হ্যাঁরে, ওসব কিছু বলেছে নাকি শান্ত ?

প্রভাতের দিকে চেয়ে থাকে কেয়া। বলে ওঠে—তুই একটা ভীতু। সুশান্ত ভীতু নয়; সে মার খেয়েছে তবু তোদের নামে কিছু বলে নি। এই তোদের বন্ধুত্ব !

—কেন ? প্রভাত ঠিক বুঝতে পারে না ওর কথা।

কেয়া বলে—আমি হলে ওই সময় ওখানে গিয়ে বলতাম, ও কিছু করে নি, ওই খেজুর রসে ম্যাগ্‌সাল্‌ফ দিয়েছি আমি।

কেয়া কথাগুলো বলে ভিতরে চলে গেল। প্রভাত খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। তার কীর্তির কথা কেউ জানে নি। তবু কোথায় একটা বেদনা ওর মনে বেঁধে কাঁটার মতো। একদিন স্থশান্তকে নিয়ে যাবে কান্দীতে ওর মামার বাড়িতে এগজিবিশনের মেলায়। দরকার হয় নিজেই গিয়ে ওবাড়ির কাকীমাকে বলবে।

কথাটা বিপুলবাবু অনেক আগে থেকেই বলেছিল। গ্রামের মধ্যে অন্যতম সঙ্গতিপন্ন লোক। নিজের চেষ্টাতে বড় হয়েছে সে। ছোটখাট কণ্ট্রাক্টটারি করতো জেলা বোর্ডে।

ছোট ভাই বিপিন কোনোদিনই বিষয় আশয়ও দেখে নি, বাইরে বাইরেই থাকে রাজনীতি নিয়ে। বিপিনের খোঁজখবরও থাকে না। কখনও যায় জেলে কখনও বা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

বিপুলবাবুই একা কোনোরকমে চালিয়েছে আর ছোট ভাই যে তাকে পথে বসিয়েছে সেই কথাটাই প্রচার করে। কষ্ট সয়ে বি. এ. পাস করাল আর ভাই কিনা রাজনীতি নিয়ে মেতেছে।

বিপুলবাবু সরকারী কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট করে ক্রমশঃ কাজ পেয়েছে, তারপর এই স্বাধীনতার পর থেকেই ছোট ভাই বিপিনের কল্যাণে বেশ বড় বড় কাজ যোগাড় করেছে। এতকাল গ্রাম থেকে কান্দী অবধি রাস্তা বলতে ছিল মাটির সরণি। বর্ষাকালে তার অবস্থা হতো ভয়াবহ। কাদা আর কাদা। গরুর গাড়িও চলতো না। মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষীর বানে ডুবে যেতো সারা অঞ্চল। সেই জলপ্রবাহের তোড়ে ঠাঁই ঠাঁই ভেঙে যায় রাস্তা—জল বেয়ে চলে।

এবার ওই রাস্তাটা পাকা হবে। সাঁকো ক্যালভার্ট তৈরি হচ্ছে। বিপিন-

বাবুই তদ্বির তদারক করে সদরের নেতাদের ধরে ওই রাস্তার কাজটা দাদার হাতে তুলে দিয়েছে।

বিপুলবাবুও কাকামণির কাছে এসেছে, প্রায়ই আসে। কি সব আলোচনা হয়। বসন্তবাবুও শুনেছে কথাটা বিপিনের মুখে—এসব জমিদারি আর থাকবে না।

—তোমরা স্বদেশী করে এবার আমাদের পথে বসাবে হে।

বিপিনবাবুকেও এবার মনে মনে খাতির করছে বসন্তনারায়ণ। বিপিনের কিই বা বয়েস, বেশ কঠিন শক্ত চেহারা। মুখচোখে একটা ঋজুতা ফুটে ওঠে। বিপিনদা হাসে—দিন বদলাবে চৌধুরী মশায়।

—তাই দেখছি।

বিপিনদা এ বাড়িতে প্রায়ই আসেন। পঞ্চায়েৎ অফিসের অন্যতম কর্তা ব্যক্তি হয়েছে বিপিনদা। সেই জন্য এখানে যাতায়াত করতে হয়।

বিপিনই পরামর্শ দেয়—তাই বলছিলাম এসব জমিদারি—জমি মহাল যা পারেন হস্তান্তর করে দিয়ে কোনো কাজ কারবারে নামুন। বসে বসে আর দিন চলবে না। একদিন এই তাসের ঘর ভেঙে পড়বে।

সুশান্ত চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনছে। কালকের সেই ঘটনার পর আজও বের হয় নি সে। জ্বর হয়েছে। কাকীমাও দেখে গেছে। সুশান্তর মনে হয় তার দেহ মনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ধকল গেছে। সেই ঝড়টার জন্যই এই জ্বর হয়ে গেছে তার।

চুপ করে বাইরের দিকে চেয়েছিল। বিপিনদার বলিষ্ঠ কণ্ঠের কথাগুলো শুনছে সে। মনে হয় এই জমিদারি—এই ধ্বংসপুরীর সব লোভ পাপের শেষ একদিন হবে। এরা শুধু অত্যাচার আর অবিচারই করে সকলের উপর। তার উপরও করুন।

কাকামণির কণ্ঠস্বরটা কানে আসে। সেই রাশভারি মানুষটার দাপট কেমন মিইয়ে গেছে কি অজানা বিপদের আশঙ্কায়। বসন্তবাবু চমকে উঠেছে। এই প্রতাপ আর থাকবে না। বলে—কিন্তু কাজ কারবার যে কিছুই করি নি

বিপিন।
—এবার করতে শুরু করুন। দাদাকেও না হয় বলি ওই কন্ট্রাকটারির কাজে আপনাকে পার্টনার করে নিন। তারপর ধরুন, রাস্তা হয়ে গেলে এদিকে সদর বহরমপুর এদিকে সাঁইথে-সিউড়ি অবধি বাসরুটও হবে। আজকাল বাস, লরির ব্যবসাও বেশ লাভের। তার জন্য ছু'একটা পারমিট যদি পেয়ে যান তবু ভালোই হবে।
বসন্তনারায়ণ বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখছে। জমিদার থেকে ব্যবসাদার! এখন দিন বদলাচ্ছে। এই যুগ আর থাকবে না।
বিপিনও বলে—এবার রাজতন্ত্র চলে গিয়ে আসছে বৈশ্যতন্ত্র। অর্থাৎ বেনি-য়ার যুগ। সময় থাকতে সেই পথেই চলবার চেষ্টা করবেন।
বসন্তবাবুর সুন্দর মুখখানায় চিন্তার ছায়া নেমেছে। তার কাছে এ একটা বিরাট সমস্যা। নতুন সেই যুগ আর নতুন সেই পথের হদিস জানে ওই আগামী দিনের মানুষ বিপিন। তারই মতে চলেছে বিপুলবাবু। চোখের উপর দেখেছে মানুষটা গুছিয়ে নিয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় বৈশ্যতন্ত্রই এবার সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে চলেছে। দেখেছে নিজে অধিকারিকে। মহাল বিক্রি করে চৌরাস্তার মোড়ে ধানকল খুলছে।
বসন্তবাবু বলে—তুমিই ভরসা বিপিন। যা হোক একটা পথ নিতেই হবে।

সুশান্ত টের পেয়েছে, এই বড় বাড়ি ধ্বসে পড়া এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে এবার বিরাট একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। এদের এতকাল আঁকড়ে ধরে থাকা যুগটা একেবারে মিথ্যা হতে বসেছে। ধ্বসে পড়ুক এদের সব কিছু।
—কেমন আছ ছোটবাবু। সুশান্ত চমকে ওঠে। বিপিনদা তার ঘরে এসেছে তাকে দেখতে।
সুশান্তর কাছে বিপিনদা যেন একটি যুগের প্রতীক। ওকে কেন্দ্র করে রয়েছে একটি আলোকোজ্জ্বল অনুভূতি। দেখেছে হাজারো মানুষের মধ্যে ওকে, শুনেছে সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। দেখেছে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করতে

পারে মানুষটি। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে বন্যার সময় তীব্র স্রোত আর ওই বিপদের মধ্যে গ্রাম গ্রামান্তরে গিয়ে বন্যাপীড়িত মানুষদের ভাঙা ঘরের চাল, না হয় গাছের উপর থেকে উদ্ধার করে এনেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনেকেই অবশ্য সাহায্য করেছে তাকে। কিন্তু বিপিন-দাই সব কিছুতে অগ্রণী। এখানকার মানুষের কাছে সে আপনজন, বলিষ্ঠ যৌবনের প্রতীক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস।

সুশান্ত হাসলো।

বিপিনদা বলে—হরিশমাস্টার খুব জ্বালায়, না? লোকটা অমনিই।

সুশান্ত কিছু বললো না। চুপ করে থাকে। হঠাৎ বিপিনদা শুধায়—কে করেছে কর্মটি বলো তো? তুমি করো নি তা জানি।

চমকে ওঠে সুশান্ত। বিপিনদাকে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। তবু জানায় —আমি করি নি। পরে অবশ্য জেনেছিলাম কে করেছে।

বিপিনদা হাসছে। সুশান্ত বলে—কিন্তু তার নামটা নাই বা শুনলেন। তাকে কথা দিয়েছি।

বিপিনবাবু হয়তো জানতে চাইবেন। সুশান্ত একটু আশ্চর্য হয়। বিপিন-বাবু বলেন—গুড। কথার মর্যাদা রাখবে! তবে বন্ধুকে সাবধান করে দিও, ওসব যেন না করে।

দিদিও বসেছিল। সে শুনছিল ওদের কথা। হঠাৎ বের হয়ে গেল মিলিদি। তার চোখের আলোয় কিসের আভা।

বিপিনদা দু' একটা কথা বলে তখন বের হয়ে গেল। সুশান্ত চুপ করে কি ভাবছে। দিদিটা তখনও ফেরে নি। বড্ড একা একা লাগে। মনে হয় দিদিও তাকে কেমন এড়িয়ে চলছে। একাই বসে আছে সুশান্ত। জানলার বাইরে মিষ্টি রোদের আভায় চাঁপা গাছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বাতাসে ওঠে মিষ্টি একটা সুবাস। দূরে দীঘির কালো জলে ঢেউ জেগেছে, ওই সামানা পার হয়ে আছে মুক্তির আলোভরা আকাশ। সেই জগতে হারিয়ে যেতে চায় অদৃশ্য অথবা কোনো নীল আলোর দেশে। একা নিঃসঙ্গ একটা লোক

চলেছে মাঠের পথ ধরে ওই রূপালী বালুচরের দিকে, সোনা-ধানের ক্ষেত পার হয়ে। ওই লোকটার মতো কোথায় আলোর জগতে হারিয়ে যেতে মন চায়।

হঠাৎ কার মিষ্টি হাসির শব্দ কানে আসে সিঁড়ির দিক থেকে। অন্ধকারের বুকে যেন বিজলীর রেখা খেলে আবার মিলিয়ে যায়। ওই হাসির সুরটা থেমে গেছে। বড় বাড়িটায় কি ফিসফিসানি স্তব্ধতা নেমেছে। বুকচাপা একটা দমবন্ধ করা নিস্তব্ধতা জাগে এখানে।

দূরে মাঠের দিক থেকে পাখীর সুর ভেসে আসে। ওই আলোর জগতের পথ খোঁজে সুশান্তর বন্দী মন।

দিদি তখনও ফেরে নি। বিপিনদার গলার শব্দ ভেসে আসছে ছাদের দিক থেকে। আরও কে যেন রয়েছে। সেই হাসির শব্দ থেমে গেছে। ওরা কি যেন কথা বলছে।

সুশান্ত একটু অবাক্ হয়। বিপিনদার মতো ব্যস্ত মানুষ এ সময় দিদির সঙ্গে কি কথা বলবে বুঝতে পারে না। চুপ করে বসে থাকে সে বিছানায়।

দিদিকে ঢুকতে দেখে ওর দিকে চাইলো। শুধায় সে—বিপিনদা চলে গেছে ?

সুশান্ত লক্ষ্য করে মিলিদি একটু চমকে ওঠে কথাটা শুনে। কিন্তু সামলে নেয়। তবু ওর চোখের সেই সলজ্জ সপ্রতিভ ভাবটা মুছে যায় নি।

মিলি জবাব দেয়—সে কি! বিপিনদা তো এখান থেকে বের হয়ে নেমে গেছে। বোধহয় কাকামণির ওখানেই গেছে। কি সব দরকারী কথা আছে।

সুশান্ত বেশ বুঝতে পারে দিদি মিছে কথা কইছে। মিলিদিটা এমনিই। ওই বলে, বুঝলি, কাকামণি বলেছে একদিন কান্দীতে মেলা দেখতে যাবো।

সুশান্ত এই মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আলো-ভরা বিচিত্র একটা জগতের ছবি!—সত্যি!

মিলিদি বলে—আমি, বিলি, শমীক যাবো সরকার মশাই-এর সঙ্গে। গরুর গাড়িতে করে।

চঞ্চল হয়ে ওঠে সুশান্ত—আমি! আমি যাবো না? বুঝলি দিদি—প্রভাত,

কেয়া ওদের মামার বাড়ি ওখানে। ওরাও যাবে কাল।

মিলিদি ওদের কথায় গা করে না। সে তার জগতের স্বপ্ন নিয়ে মশগুল।

সুশান্তর অভিমান জমে ওঠে সারা মনে।

মিলিদি গল্প করে চলেছে—মেলায় সার্কাস, সিনেমা, কতো শাড়ির দোকান এসেছে। রাঙাপিসী গিয়েছিল—কি এলাহি কাণ্ড হচ্ছে সেখানে।

—উস্!

ওরা সবাই সেই আলোর স্বপ্নকে ছুঁয়ে আসবে, যেতে পারবে না একা সুশান্ত। সেকি যেন মস্ত অপরাধ করেছে। অথচ জানে সে কোনো দোষই করে নি। কাকামণির উপর রাগ হয়। কাকীমাকেও বলবে না সে। যাবে না ওই মেলায়। মনে হয় কোনো এক পৃথিবীর পথে হারিয়ে যাবে সে। সেখানে ভুল বোঝাবুঝি নেই। এমনকি অন্যায় শাসন আর অবিচার নেই। সবুজ চারিদিক, আলোয় আলোয় হলুদ হয়ে উঠছে তার বুক, পাখীর ডাকে মুখর।

মাঠে মাঠে সোনা রঙের ধানগুলোয় বাতাস শিরশিরিয়ে ওঠে। ওরা চলেছে। চলেছে সুশান্ত স্বপ্ন দেখা সেই জগতের পথে। যে কোনো কারণেই হোক কাকামণি আর বাধা দেয় নি। মিলিদি, বিলিদি, শমীক আর সে চলেছে মেলার দিকে।

ধূলিধূসর মেঠো সড়কের দুধারে ধানক্ষেত। বাতাসে পাকা ধানের মিষ্টি গন্ধ ওঠে। ল্যাজঝোলা ফিঙেপাখীগুলো আলের ধারে কুঁড়ে বুড়োর মতো শীতের রোদ পোয়াচ্ছে। গরুর গাড়ির চাকার শব্দ ওঠে। সামনে পথের ধারে ঝাঁকড়া বিরাট বটগাছের কাছে আসতে পড়ন্ত বেলাতেও কেমন গা ছমছম করে। ওই গাছটার নাম আধাবটতলা। দিগন্তপ্রসারী মাঠের এদিক ওদিকে গ্রামের ছায়াঘেরা সীমান্ত দেখা যায়; আশেপাশে গ্রাম নেই। মাঠের মধ্যে ছায়া অন্ধকার জড়ানো গাছটাকে কেন্দ্র করে অজানা ভয় আর কি রহস্য জড়ানো। ওখানে নাকি ডাকাতের দল বসে থাকে। সুযোগ

পেলেই পথিক না হয় গাড়িগুলোর উপর হানা দিয়ে সব কিছু কেড়ে নেবে, প্রাণটুকুও।
মিলিদি বলে—কি রে শান্ত ! চুপ করে গেলি যে !
—কই না ! কি সুন্দর গাছটা, তাই না দিদি! কেমন যেন সম্রাটের মতো।
সুশান্ত মাঝে মাঝে সব উপমা দিয়ে কথা বলে। ওই গাছটাকে দেখে অমনি একটা কিছু মনে এসেছিল। সারা মাঠের বিস্তারের মধ্যে ওইটাই সব থেকে বিরাট, ছায়াস্নিগ্ধ আর অনেকের আশ্রয়স্থল।
মিলির ওসব কথা শোনার অবকাশ নেই। শমীককে বলে—সিনেমা দেখতে হবে কিন্তু শমী।
—সিওর ! শমীক সায় দেয়। ও কি ভাবছিল সেই হরিশমাস্টারের গোল-গাল মেয়েটার কথা। মিনতি ওদের আসার কথা শুনে বলেছিল সেও যাবে। শমীকের খুব ইচ্ছে ছিল ওকে আনার। কিন্তু মিলিদির জন্য আনতে পারে নি। দুজনে কেমন আসতো। শমীকের মনে সেই লোভটাও ছিল। কিন্তু তা হয় নি।
শমীক তবু মেলা দেখার আনন্দে সেই দুঃখটাকে ভুলেছে।

শহরে ঢোকবার মুখে নদীর ধারে বিরাট মাঠটায় মেলা বসেছে। সার্কাসের বড় তাঁবুতে সারবন্দী ইলেকট্রিক বাল্‌বের মালা ঝোলানো আলোর মালা পরিয়েছে তাঁবুটাকে। সুশান্ত মিলিদি ওরা সকলে চলেছে মেলার দোকান-পশার দেখতে দেখতে।
বিপিনদাকে এখানে দেখবে আশা করে নি। একটা বড় তাঁবুতে রিলিফের ক্যাম্প বসেছে।
বিপিনদা ওদের দেখে এগিয়ে আসে—তোমরা এসেছ ?
মিলিদি ওর দিকে চেয়ে হাসলো। বিপিনদাকে ঘিরে কতো ছেলে ব্যাজ পরে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। কোথায় জলের ব্যবস্থার গোলমাল হয়েছে তারা ছুটলো, ভিড়ে কে ছিটকে গেছে তাদের খুঁজে পেতে দেওয়ার কাজ

করছে। একটা বড় উঁচু মাচার উপর ছেলেরা পাহারায় রয়েছে। কোথায় আগুন লাগলো কিনা নজর রাখছে তারা। বিরাট এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম হোতা বিপিনদা। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী, ময়লা ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডেল।
সুশান্ত লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। বলিষ্ঠ কর্মঠ একটি তরুণ। মিলিদি বলে—আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে মেলায় ঘুরবেন।
সুশান্তর বিশ্রী লাগে দিদির কথাটা। বিপিনদার [illegible] কাজ। এখন ওর বেড়াবার সময় কোথায়? বিপিনদাও হাসলো, জানায় সে—এখন পোস্ট ছেড়ে যাবার উপায় নেই মিলু। আমি বরং দুজন ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি, ওরা তোমাদের ঘুরিয়ে আনুক।
মিলির মুখখানা যেন অন্ধকার হয়ে ওঠে। ও বেশ কঠিন সুরেই জানায়—যাক্, তার দরকার হবে না। চল রে শমী!
শমীকও তৈরি ছিল। মেলার রঙবাহারে সে বয়স্ক কারোও সঙ্গে ঘুরতে নারাজ। এর মধ্যে সিগ্রেটও কিনেছে। তা ছাড়া সুশান্ত দেখছে শমীক এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের দিকেই যেন হাঁ করে চেয়ে আছে। বেশ তারিয়ে তারিয়ে এসব দেখছিল। শমীক মিলির কথায় বলে—তাই ভালো চলো।
সুশান্ত বিপিনদার হয়ে দিদিকে বলতে যায়—এখন বিপিনদা যাবেন কি করে? এতো কাজ।
মিলি রেগে ওঠে—যাক। তোকে আর ওস্তাদী করতে হবে না। এতো যদি জ্ঞান হয়েছে তাহলে এইখানে থাক। আমরা চললাম। চল শমী।
সুশান্ত মিলিদির এই রাগের সঠিক কারণ খুঁজে পায় না। বরং রাগই হয় তার। ওদিকে ছেলেরা দুজন লোককে ট্রেচারে করে বয়ে এনেছে। অসুখ নিয়ে এসেছিল, এখানে সেই অসুখ বেড়ে গেছে। ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিপিনবাবু। ডাক্তারও রয়েছেন, তাঁরা দেখছেন।
বিপিনদা হঠাৎ সুশান্তকে এখানে দেখে একটু অবাক হন। মিলিরা চলে গেছে, সুশান্ত যায় নি। বিপিনবাবু ওকে শুধোন—তুমি গেলে না?
বলে ওঠে সুশান্ত—এখানে কাজ করতে নেবেন আমাকে?

বিপিনবাবু ওকে দেখছেন। সুশান্তর চোখে মুখে কি একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলে ওঠে সুশান্ত—আমি পারবো।

বিপিনদা ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর আসবে তুমি। ঠিক তো?

সুশান্ত মাথা নাড়ে। মনে হয় বিপিনদা মানে একটা কর্মমুখর জগৎ সেখানে আছে তৃপ্তি, নিঃস্বার্থ সেবার সাধনা আর ত্যাগ। এই আলোর ইশারা-টুকুকেই অন্বেষণ করে ফিরছে সে।

সুশান্ত একাই বের হয়ে এসেছে ক্যাম্প থেকে। মেলার লোকের ভিড় উথলে পড়েছে। দোকানের সামনের রাস্তাগুলোয় জনস্রোতের মতো মানুষ চলেছে। ভেবেছিল শমীক, দিদিদের খুঁজে নিতে পারবে, কিন্তু বের হয়েই অবাক্ হয়েছে। এই জনস্রোতে সেও যেন হারিয়ে যাবে।

আলো আর ওই দোকানের জিনিসপত্র লোকজনের ভিড় সবকিছুর মধ্যে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। ফেরার পথ নেই। দু'একবার অন্য পথে গিয়েছে কিন্তু সেই পথও হারিয়ে যায় কোন্ দিকে। শুধু দোকান থালা বাসনের পটি, না হয় মিষ্টির দোকানের সারি, না হয় মনিহারী দোকান।

তুই! হঠাৎ দিশাহারা সুশান্ত প্রভাতের ডাকে চমকে ওঠে। ময়ূরাক্ষীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল সেবার বানে বানে সাঁতার দিতে গিয়ে। তখন মনে হয়েছিল আর ফিরতে পারবে না সে, শুধু জলের কল-কল্লোল। হঠাৎ সেবার চরে উঠেছিল, কাশবন ভরা এক চরে।…তবু মাটি পাবার আনন্দে দিশাহারা হয়েছিল সে। আজও যেন তেমনি মাটি পেয়েছে পায়ের তলে। প্রভাত আর কেয়াকে দেখে এগিয়ে আসে সুশান্ত।

কেয়া খুশীতে উপছে ওঠে। ও চেয়েছিল সুশান্তও আসবে মেলায়। সেই আশা তার পূর্ণ হয়েছে।

—তুমি এসেছো তাহলে! কেয়া খুশীভরা স্বরে শুধোয়। সুশান্ত হাসলো। নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। প্রভাত বলে—মেলায় দু'তিনবার ঘুরেছি। সব আমার জানাশোনা হয়ে গেছে। চলো আজ সিনেমা দেখতে যাবো। ভালোই হয়েছে

তুই এসেছিস।

সুশান্ত ভাবছে ওরা তাকে খুঁজবে। মনে হয় দিদিও মেলা দেখতে গিয়ে তার কথা ভুলে গেছে। তাছাড়া তাকে ফেলে রেখেই চলে গেছে তারা, সুতরাং তারও কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

কেয়া তাগাদা দেয়—চলো। ওদিকে সাতটার শো আরম্ভ হয়ে যাবে।

কেয়া আজ সেজেছে। সুন্দর লাগছে তাকে এই ইলেকট্রিক আলোর আভায়। ওর ফর্সা রং আরও কমনীয় হয়ে উঠেছে। চোখের কাজল চোখ দুটোকে কি মায়ায় ভরে দিয়েছে। ওর মনের আঁকা ছবির সেই মেয়েটিকে আজ নতুন চোখে দেখেছে সুশান্ত এখানে।

কেয়া কিছু ডালমুট আর চকোলেট কিনে নেয়। বলে—সিনেমা দেখতে দেখতে খাওয়া যাবে।

ওরা চলেছে। এদিকটায় অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। দোকানের চাপ নেই। তবু মানুষের ভিড়ও বেশ। বাইরে তত জোরালো আলো নেই। কেয়া বলে—তুমি এসেছো খুব ভালো হয়েছে। সত্যি তোমার কথা মনে হচ্ছিলো।

সুশান্ত এই মেয়েটিকে যেন চেনে না। সহজভাবে তার পাশে হেঁটে চলেছে কথা বলছে। প্রভাত গেছে টিকিট কিনতে। কেয়ার চোখে মুখে আবছা আলোর আভাস। কি এক বিচিত্র জগতের স্বপ্ন মাখানো তাতে। সেই জগতের স্বাদ জানে না সুশান্ত তবু মিষ্টি লাগে এই সান্নিধ্যটুকু। ওই মেয়েটি যেন তারই একান্ত আপনার।

কেয়া বলে—সেদিন আমার উপরও রাগ করেছিলে, না? সুশান্ত বোঝে কেয়ার চোখে সেদিন জলের কারণটা। অকারণেই তাকেও আঘাত দিয়েছিল সে। সুশান্ত বলে ওঠে—সত্যি সেদিন অন্যায় করেছিলাম কেয়া।

কেয়া ওর দিকে ডাগর আয়ত চোখের চাহনি মেলে চেয়ে থাকে। এই ছায়া আঁধারে কি স্বপ্নলোকের আশ্বাস দেখছে সুশান্ত ওর চোখে।

এক বিচিত্র জগতে হারিয়ে গেছে সুশান্ত। চোখের সামনে থেকে কোলাহল, মেলার জনস্রোত কতো পরিচিত মানুষের মিছিল সব হারিয়ে গেছে।

আকাশ জুড়ে সাদা টুকরো মেঘের মেলা, মাটিতে শুধু কাশফুলের শ্বেত চামর দোলানো জগৎ দূর দূরান্তের সেই আলোভরা ফুলফোটা জগতের পথে হারিয়ে গেছে একটি শিশু। ছু'চোখে তার বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি। নতুন এক সুন্দর জগৎকে সে প্রত্যক্ষ করছে। বাতাসে সুর ওঠে শনশন সুর, প্রাণের সাড়া।

—শান্ত! অ্যাই।

সুশান্তর কোনো সাড়া নেই। ওই পর্দায় গড়ে ওঠা জগতের অসীমে ওই সুন্দরের রাজ্যে সে হারিয়ে গেছে। অপুর সঙ্গে সেও যেন ঘর থেকে পালিয়েছে ওই জগতের সন্ধানে।

ওই হতদরিদ্র ছেলেটির দুঃখে তার চোখেও জল নামে। বড় গরিব ওরা। বর্ষার রাতে ওদের আশ্রয় নেই। খেতেও পায় না তারা। বাবা কোথায় বিদেশে গেছে—মা ওই ছুটি শিশুকে নিয়ে আতঙ্কিত বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গোনে।

তবু সেই ভাই বোনের কাছে এই পৃথিবী সুন্দর। আলোভরা শ্যামল পরিবেশ—বাওড়ের জলে পদ্মফুলের মেলা। সেই জগতে ওরা পথ খোঁজে। ওদের নিজের জগৎ রচনা করে। হঠাৎ সেই একই বৃন্তে ফোটা ছুটি কুঁড়ির থেকে একটি ঝরে গেল।

বোন মারা গেল, মৃত্যুর এই রূপ দেখে নি সুশান্ত। চোখের সামনে সব তারও যেন হারিয়ে যায়। নিভে যায় সব আলো আর আশ্বাস। মনে হয় তার ওসব ফুরিয়ে গেছে।

—শান্ত!

ফিসফিসিয়ে ওঠে কেয়া—ও মা! কাঁদছো তুমি?

অবাক্ হয়েছে কেয়া। শান্তও বোঝে নি, এটা সত্যি নয়—ছবি মাত্র। তবু মনে হয় এই জীবনের মূল সুর আর বেদনাকে সেও অনুভব করেছে সারা মন দিয়ে।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা। সেই কিশোর বালক পিছনের ছায়ারৌদ্র-

ভরা স্মৃতির জগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গী নেই—দিদিও চলে গেছে কোনো অজানা জগতে। ও-অন্তবিহীন পথের সন্ধানে ছেলেটিও হারিয়ে গেল।

আলো জ্বলে উঠেছে। সেই স্বপ্নজগৎ হারিয়ে যায়। এতক্ষণ সুশান্ত এক বিচিত্র রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। লোকজনের কলরব কানে আসে।

কেয়া বলে—একেবারে যেন কোথায় চলে গিয়েছিল। উঃ! ডেকেও সাড়া পাই নি।

সুশান্তর চোখ মুখ তখনও ভারী হয়ে আছে। ও সেই স্বপ্নের ঘোরটা থেকে তখনও মুক্ত হতে পারে নি। বারবার সেই ছায়ানিবিড় গ্রামসীমা আর দুটি কিশোর কিশোরীর কলরব, সেই স্বপ্নসুন্দর জগতে হারিয়ে যাবার আনন্দটাকে অনুভব করেছে। অনুভব করেছে অপুর বেদনাকে, দুর্গার মৃত্যুকে।

সুশান্ত বলে—সুন্দর বই, না রে? এমন হতে পারে জানতাম না। বুঝলি কেয়া, দুঃখটাই সবচেয়ে বড়। এতো সুন্দর সবকিছু, তবু ওইটা যেন অনেক সত্যি।

কেয়া ওর দিকে চেয়ে থাকে। ওর কথাগুলো শুনছে। ঠিক বুঝতে পারে না, তবু মনে হয় ওই ছবি আর এই কথাগুলো তার মনে একটা বিচিত্র সাড়া আনে।

ওর কালো চোখের চাহনিতে সেই সুরের অনুরণন। প্রভাত ওসব বোঝে না। ও বলে—ধ্যাৎ! নাচ গান থাকবে, রাজসভা থাকবে, হাসিটাসি থাকবে তা নয় যত্তোসব! আরে এই বুনো গাছগাছালি আর ছেলেদের নিয়ে ছবি! এই দেখতে এলাম!

কেয়া দাদার দিকে চাইলো, সুশান্তও।

প্রভাত বলে—তাই হাঁ করে দেখছিলি! গাড়োল কোথাকার। চল, বাড়ি ফিরতে হবে, মামা আবার বকবে দেরি করে গেলে।

সুশান্ত প্রভাতের এই রুচিবোধের প্রশংসা করতে পারে না। ওর ব্যাপারই আলাদা। প্রভাতকে দেখেছে কেশেরপাড়ের মেলায় ঝুমুরের আসরে, না

হয় কবিগানের আসরে বসে খেউড়ি শুনে উপভোগ করতে। ওই বিশ্রী রসিকতায় কান গরম হয়ে ওঠে সুশান্তর। লজ্জা করে ওসব শুনতে। এ-দিক ওদিক চেয়ে দেখে চেনাশোনা কেউ আছে কি না। প্রভাত রাতের অন্ধকারে ওই বিশ্রী জগতেও নিয়ে গেছে তাকে।

সুশান্ত বলে—চল প্রভাত, বাড়ি যাই।

প্রভাত জাঁকিয়ে বসে বলে—দাঁড়া না, ওর জবাবটা শুনে যাই।

প্রভাত এক জায়গায় কেমন স্থূল আর বেয়াড়া। তাই ভয় হয় প্রভাতকে। কিন্তু অন্য সময় প্রভাত আলাদা। আজও প্রভাতের সেই রুচিটাকে সে বদলাতে পারে নি।

সুশান্ত বলে—এসব তুই বুঝবি না। নইলে—

কেয়ার সামনে ওদের লুকোনো সেই রাতের অভিজ্ঞতার কথা সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রভাতের চোখের ইশারায় থেমে গেল সে। সুশান্তর মনে হয় অনেক কিছু আছে যা কেয়ার সামনে বলা যায় না।

কেয়া তার কাছে একটা নীরব সৌন্দর্য আর শুচিতার প্রতীক। সেই অনু-ভূতিটা তার মনকেও শান্ত করে তুলেছে।

প্রভাত বলে—চল, তোকে বিপিনদার ওখানে দিয়ে যাই। ওরাও হয়তো খুঁজছে।

রাত হয়ে গেছে। মেলার সেই জোয়ার কমে এসেছে। লোকজন এখন ঘর-মুখী। দলে দলে আশপাশের গ্রামের লোক মেঠো পথ ধরে ফিরে চলেছে। অন্ধকারে তাদের কলরব—একে ওকে ডাকাডাকির শব্দ ওঠে। মেলার সেই আনন্দমুখর পরিবেশে এসেছে স্তিমিত ভাব।

সুশান্তর কেমন ভয় ভয় করে। ওরা বোধহয় তাকে খুঁজছে। প্রভাতই ওকে নিয়ে এলো মজা খালের ধারে সেই ক্যাম্পে।

প্রভাত বলে—দাঁড়া দেখে আসছি তোদের গাড়িটাআছে কিনা। নইলে রাতে আমাদের ওখানেই যাবি।

সুশান্ত ঘাবড়ে গেছে।
সেও এদিক ওদিকে খুঁজতে থাকে। হঠাৎ খালের আলো-আঁধারির ও-দিকে দিদিকে বিপিনদার সঙ্গে কথা বলতে দেখে অবাক্ হয়।
মিলিদি হাসছে খিলখিল করে। ওর এই হাসি বিশেষ দেখে নি। বিপিন-দাও এক মনে কি বোঝাচ্ছেন ওকে। কচি খুকীর মতো গলা ফুলিয়ে মিলিদি আবদার করে—না না! তুমিও যাবে।
বিপিনদা ওকে কি বোঝাবার চেষ্টা করতে থাকে।
—মিলি। শোনো—
দুজনকে এমনি নিভৃতে এখানে আলাপ করতে দেখে সুশান্ত চমকে উঠেছে। কেয়াও দেখছে ওদের। সুশান্তদের ওরা দেখতে পায় নি। ও এগিয়ে যাবে কি না ভাবছে, হঠাৎ কেয়ার হাতখানা ওর হাতে এসে ঠেকেছে। উষ্ণ একটু উত্তাপময় স্পর্শে চমকে উঠে সুশান্ত ওর দিকে চাইলো। কেয়ার চোখে কি কৌতূহল আর বিস্ময়!
ইশারায় ওকে সরে আসতে বলে।
কেয়া তার চেয়েও জীবনের একটা দিককে ভালো করে দেখেছে। রহস্য-ময়ী মেয়েটিকে সে চেনে না।
সরে এল সুশান্ত—কি ব্যাপার!
কেয়া একটা গাছের আলো-আঁধারির নিচে এসে ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে। ওর হালকা পাতলা দুই ঠোঁটে কি গাঢ় কৌতুকের হাসি।
হঠাৎ প্রভাতকে কলরব করে ফিরতে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে বিপিনদা। মিলিদি এগিয়ে এলো।
প্রভাত বলে চলেছে—ওই তো খালের ধারে তোদের গাড়ি রয়েছে শান্ত। মিলিদি নাকি কি কিনতে গেছে। এলেই কিন্তু গাড়ি ছাড়বে।
মিলি এগিয়ে আসে, ওর মুখ-চোখের সেই বিচিত্র হাসি মিলিয়ে গেছে। ওদিকে কেয়া আর সুশান্তকে দেখে অবাক্ হয় সে। ওর মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন একটা ভাব। বলে ওঠে সে—কোথায় ছিলি শান্ত? কেয়াই বা

লো কি করে ?

শান্ত ওর এই গার্জেনগিরি দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জবাব দেয়
—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। 'পথের পাঁচালী'।

—ওমা! সিনেমায় গিয়েছিলি? কি ডেঁপো ছেলে রে তুই? একেবারে এঁচড়ে পেকে গেছিস।

দি মন্তব্য করে। ওর কথায় শাসানির সুর ফুটে ওঠে।

—চল, কাকামণিকে গিয়ে বলবো।

শান্ত কি যেন একটা গুরুতর অন্যায় করেছে। তার শাস্তি হওয়া দরকার। াসন করা প্রয়োজন তাকে।

শান্ত ওদের শাসনকে আজ ভয় করে না। অন্যায় ভাবে তারা তাকে দিন অপমান করেছিল, মেরেছিল। আজও সে কোনো অন্যায় করে নি। ই অনুভূতির পরম তৃপ্তি তাকে ওদের সব অন্যায় শাসনকে তুচ্ছ করার ক্তি এনে দেবে। তা ছাড়া দেখেছে, মিলিদির মনের সেই অন্য রূপটাকে। যেন আরও কি পেতে চায়।

কেয়া মিলিদির মুখে ওইসব শাসানির কথা শুনে শিউরে ওঠে। জানে, ওর াকামণি এমনি নির্দয় ধাতের মানুষ। সেদিনের মতো আবার মার খেতে বে সুশান্তকে। আর আজকের এই ব্যাপারের জন্য সেও দায়ী।

কেয়ার মনে জাগে সমবেদনার সাড়া। সে এগিয়ে গিয়ে কৈফিয়তের সুরে ানায়—সত্যি মিলিদি শান্তর দোষ নেই। ও সত্যিই যেতে চায় নি আমরাই লাম।

শান্ত কঠিন স্বরে জানায়—তুই থাম কেয়া। আমি নিজেই গিয়েছিলাম িনেমা দেখতে। তার জন্য যা ভালো বোঝে ওরা করুক। আমি ভয় পাই া।

কেয়া চুপ করে যায়। প্রভাত বলে ওঠে—বাঃ মোস্ট কারেজাস্ বয়।

বিপিনদা হেসে ফেলেন। মিলি ওর দিকে চাইলো। সুশান্ত কঠিন হয়ে ঠেছে। বিপিনদাই ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বলে—পথের পাঁচালী

খুবই ভালো বই। দেখে ভালোই করেছো শান্ত। লাইব্রেরীতে আছে, গিয়ে বইটাও পড়ো। মিলি তোমাদের রাত হচ্ছে। এতখানি পথ যেতে হবে। আর দেরি করো না।

মিলি শুধায়—আপনি যাবেন না?

হাসলেন বিপিনদা—নাঃ। ক্যাম্পের চার্জ ফেলে আমার যাবার উপায় নেই।

প্রভাতরা ফিরে গেছে মামার ওখানে। সুশান্ত চুপ করে এসে গাড়িতে বসেছে। শমীক রেকর্ডে শোনা হিন্দী ছবির গান গাইছে। ওরা ফিরছে গ্রামের দিকে।

নির্জন রাত। কুয়াশার চাদর জড়ানো রাত্রি। চাঁদের আলো শীত রাতের হিমে মিশে যেন রুপোগলা তরল ধারায় লুটিয়ে পড়েছে ঘুমঢাকা গাছ গাছালির মাথায়।

চাকায় বালি মাটির ঘষটানির একটানা শব্দ উঠছে। পথের কি সুর বাজে তাতে।

ছইয়ের বাইরের দিকে চেয়ে আছে সুশান্ত। তারা-জ্বলা আকাশ পার হয়ে কোথায় অদৃশ্য এক কল্পজগতে হারিয়ে যায় সে! সেখানে ফুটে উঠেছে আলোর ইশারা। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় কোন্ পথিক ফেরা হয়ে যায়। কাশফুলের দিগন্তপ্রসারী শ্বেত উত্তরী ঘেরা এক মনোজগৎ সেখানের বিরাট বিশ্বের দিকে চেয়ে আছে বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দিশাহারা একটি শিশু। কোনো পথের সন্ধান করে।

সেই পথই তাকে ললাটে ধূলিতিলক এঁকে তার অন্তহীন যাত্রার দিশা করেছে কি অদৃশ্য ইঙ্গিতে। ডাক দিয়েছে তাকে কোনো এক বিচিত্ররাজ্য —তার পথ অনেক অনেক দূরে। সেই পথের সন্ধান করে একটি কিশোর আজও এই কুয়াশামগ্ন তামস রাত্রির মধ্য প্রহরেও।

মিলিদি ওই স্তব্ধ ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনে হয় সুশান্ত অনেক

বড় হয়ে গেছে। ওর মনের মাঝে নতুন একটা প্রশ্ন বেজেছে।

মিলির নিজের মনেও তেমনি একটা বিচিত্র অনুভূতি জেগেছে। এখানে এসেছিল সে এমনি একটি মন নিয়েই। একজনকে কেন্দ্র করে কি বিচিত্র স্বপ্ন দেখে সে।

বিপিনবাবুকে তার ভালো লাগে। এই ভালোলাগারমূলে আর কি আছে জানে না। কি যেন একটা নেশার ঘোরের মতোই ওকে দুর্বার আকর্ষণে টানে।

মিলিও দেখেছে বিপিনকে এই বাড়িতে যাতায়াত করতে। ওর এই আসার কারণটাও নিজের মন দিয়ে বুঝেছে। এমন স্তব্ধ রাতের নির্জনে একজনের কথাই মনে পড়ে। তার সব চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলিষ্ঠ ওই মানুষটি।

যেই নীরব বাধা পেয়েছে, বিপিনবাবুর দিকে থেকে ততই জেদ বেড়ে গেছে তার। নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে মোহময়ী করে তুলেছে। নিজের মনের অতলের এই চিরন্তন নারীকে সেও এতদিন চেনে নি। আজ অনেক আনন্দ বহু আশায় আর স্বপ্নে তাকে চিনেছে।

সে অনেক কিছু পেতে চায়, ওই কঠিন অধরা মানুষটাকে নিজের হাতে আনতে চায়, জয় করতে চায় তাকে। গাড়ির ঝাঁকুনি লাগছে। ক্লান্ত মিলির চোখে কি আবেশ জড়ানো ঘুম ঘুম ভাব জাগে।

জেগে আছে শমীক। এই শীতের হিমে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানছে। তার চোখের সামনে আধাশহরের মেয়েদের নিটোল দেহ আর সেজে ওঠা রূপটাই চোখে পড়েছে। আর একদিনও আসবে সে।

শান্তির কথা মনে পড়ে। এই হিম রাতে তার দেহের অণু পরমাণুতে একটা সাড়া জাগে; মেয়েটা তার চারিপাশে ঘুরছে, কালও আসবে। মেয়েটার জন্য একটা মালা কিনেছে। বেশ কাছে টেনে এনে ওর সদ্যজাগর মাংসল দেহটাকে জড়িয়ে ধরে মালাবদলের ভঙ্গীতে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দেবে শমীক।

ধ্যাৎ! মেয়েটার যেন কেমন ঢলে পড়া ব্যাপার। একটু তেজী মাথাটাড়ো মেয়েকে জয় করার আনন্দ এতে নেই। তবু একটা নেশার মতো লাগে শমীকের। কেয়ার কথা মনে পড়ে। সুন্দর দোহারা মেয়েটা।
হঠাৎ চমকে ওঠে শমীক। সামনে আধা বটতলার বিরাট ছায়া আঁধার জড়ানো গাছটা এসে পড়েছে। শমীক গাড়ির ভেতরে এসে বসল। ভয় ভয় করছে।
ওই ঘন ছায়া আঁধারের মাঝে মাঝে ডালপাতার প্রহরা এড়িয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে। কি যেন লিখে রেখেছে রূপালী আখরে। শনশন শব্দ ওঠে বাতাসের, জমা হিম গলে পড়ছে গাছের পাতায়। টুপটাপ শব্দ শোনা যায়।
সুশান্ত কোন্ এক শান্ত প্রগাঢ় মাধুর্যভরা আলোআঁধারির বুকে হারিয়ে গেছে। কি নতুন চোখে দেখেছে আজ সে এই জগৎকে।

কিন্তু তাকে নিয়েই এই সমাজ গড়ে ওঠে নি। সেখানে সুশান্ত নিজের মনের ছকটাকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে বাধা পায় প্রতি পদে পদে। দেখছে, চারিদিকের মানুষের লোভ আর লালসাভরা মনটাকে তাদের মনের কালো ছায়াটা অনেক আলোকে ঢেকে দিয়েছে, এনেছে অনেক যন্ত্রণা। সুশান্ত দেখেছে এই ধ্বংসপুরীর মানুষগুলোর মনের মধ্যে কার সেই কালো ছায়াটাকে।
সামনে ওদের ক্লাস ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা। প্রভাতও দেবে। শমীকও এবারই দিতো, কিন্তু ফেল করেছে। এতকাল শমীককে মাস্টারমশাইরা ঠেলে ঠেলেই এগিয়ে এনেছেন। কিন্তু এবার আর রাজী হন নি তাঁরা।
বসন্তবাবু গুম হয়ে বলেন শমীককে—এই ক্লাসেই থাক হতচ্ছাড়া বাঁদর কোথাকার। পড়াশোনা করবি কখন?
শমীক অবশ্য এইসব গায়ে মাখে না।
এর মধ্যেই সে বিপুলবাবুর সঙ্গে বাবার হয়ে ঠিকাদারীর কাজকর্ম দেখছে

শুরু করেছে। একটা মটরবাইকও কিনেছে, ওতে নাকি কাজের সুবিধা হয়।

তা ছাড়া কিছু কাঁচা পয়সার মুখ দেখেছে শমীক, তার চালও বেড়ে গেছে। সেই ভাষাতে সে জানায়—তাই হবে। তবে এবার কিন্তু বাস রুটের দরখাস্তটা করে দিও বাবা। শুনছি চারখানা গাড়ি স্যাংশন হবে। সুশীলবাবু বলেছেন—দরখাস্তখানা আমাকেই হাতে করে সদরে নিয়ে যেতে। দুটো রুট-পারমিট পেয়ে গেলে—

বসন্তবাবু অবশ্য ছেলের এই দিকটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না। কথাবার্তায়, চালচলনে শমীক এখন থেকেই তৈরি হয়ে উঠেছে। অবসর সময়ে সদরে, মহকুমা শহরে নেতাদের ওখানে যায়। ছাত্র আন্দোলনের সেও নাকি একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছে। তাই পড়ার দিকটা দেখার দরকার নেই। তবু বিপিনদাই বললেন—পরীক্ষাটা দাও শমীক। কলেজে যেতে হবে, সেখানে তবু ভালো ফিল্ড পাবে।

শমীক মটরবাইক দাবড়ে সদরে যাতায়াত করে, দেখেছে অনেক কিছুই। অন্ধকার রন্ধ্র পথে পারমিট, কোটা আরও নানা ফাঁক ফিকির দিয়ে লোন-টোন বের করে ব্যবসা ফাঁদার স্বপ্ন দেখছে।

বিপিনদার জনপ্রিয়তা আর প্রতিষ্ঠার কথাটা জেনেছে সে। তার এই মেলামেশার সুযোগটা করে দিয়েছেন স্বয়ং বিপিনদাই। বসন্তবাবুও জানেন সেটা।

জমিদার চলে যাবে, এবার পাকাপাকি আইন হয়ে গেছে। তাই বিপিনকে তাঁর দরকার। বাস রুট দুটো পেতেই হবে। তার সঙ্গে এইসব ঠিকেদারীর কাজ চললে বসন্তবাবুকে ভাবতে হবে না। অন্য জগতের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

তাই বিপিনকে মান খাতির করেন। বসন্তবাবুও জানেন বিপিনের এখানে আসার কারণটা। অন্ততঃ তার মনের দিক থেকেই এই বিচার করেন তিনি। স্ত্রীকেও বলেন—দ্যাখো না, যদি ছেলেটাকে কোনো মতে আটকাতে পারো।

তা ছাড়া পালটি ঘর। মিলির শুনেছি অমত নেই। বিপিনের সঙ্গে তার মেলামেশাও আছে।

সুশান্ত সিঁড়ির মুখে দিদিকে দেখেই সরে দাঁড়ালো। সুশান্ত বাবাকে একটা চিঠি লিখেছে তার কিছু টাকার দরকার। জামাকাপড় কিনতে হবে। সেই চিঠিখানা হাতে দেখে মিলিদি বলে ওঠে ফিসফিসিয়ে—কি রে, লভ লেটার বুঝি? এ্যাঁ, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো তা জানি? কেয়ার চিঠি বুঝি!

মিলিদির চোখে কি এক অন্য ধরনের হাসির উচ্ছলতা। ওর দেহ ঘিরে একটা নির্লজ্জতার প্রকাশ, তারই আভাস ওর ওই সব কথায়।

সুশান্ত চমকে ওঠে। ওর মনের এই বাঁধনছেঁড়া দিকটার কথা সে জেনেছে। ক্রমশঃ বিপিনদার মতো লোককেও সে জড়িয়ে ফেলতে চায়, ওদের সঙ্গে এই হীনষড়যন্ত্রে সে যোগ দিয়েছে। বিপিনদার মতো লোককেও তারা যেন ধরে বেঁধে একটা বিপদে ফেলতে চায়।

সুশান্ত মিলিদির উপর আজ নিদারুণ ঘৃণা বোধ করে।

কাকামণিকেও সে আজ আর শ্রদ্ধা করতে পারে না। দিদির কথায় জবাব দেয় সে—বাবাকে চিঠি দিচ্ছি।

মিলির মুখ চোখের চেহারা বদলে যায়। ওর দিকে চেয়ে বলে সে—কি রে, এন্তার নালিশ করেছিস বুঝি আমার নামে? কি লিখেছিস?

সুশান্তর মনে হয় গলা ছেড়েই সে জানায় যে, লেখে নি ওসব কথা। এবার জানাবে বাবাকেও। মিলিদিও যেন ভেবে নিয়েছে ওর মনোভাবটা। তাই জানায়—লিখে মাথা কেটে নিবি, এ্যাঁ।

সুশান্ত দাঁড়ালো না। মিলিদি শাসায়—তোর কীর্তিকাহিনীর কথাও ফাঁস করে দেবো। দুজনে ঘটা করে সিনেমা দেখা হয়েছে, মেলা দেখা হয়েছে। লভ করা হচ্ছে!

—দিদি—! সুশান্ত রুখে দাঁড়িয়েছে ওর কথায়।

হাসছে মিলি খিলখিলিয়ে। ওর সারা দেহে সেই নিষ্ঠুর হাসির প্রকাশ। বলে সে—ল্যাজে পা পড়তেই ফোঁস করে উঠলি যে! এ্যাঁ।

সুশান্তর বিশ্রী লাগে। কান গাল ওর লাল হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝেছে, ওই দিদির কাছ থেকে হঠাৎ যেন অনেক দূরে সরে গেছে সে। দুজনের জগৎ স্বতন্ত্র—অন্য রূপের। দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই।
সরে গেল সুশান্ত। ওর মনে হয় এরা সকলেই কি একটা ভুল পথে চলেছে। হয়তো ঠিক পথে চলেছে তারাই, ভুল করছে সে। তবু মনে হয় বিপিনদাকেও কথাটা জানাবে। বলে দেবে—ও যেন এ বাড়িতে আর না আসে। তার মতো লোকের এ বাড়িতে না এলেও চলবে।

স্কুলের তাড়া আজ নেই। কি একটা ছুটির দিন। বাড়িতেও ভালো লাগে না। শমীক মটরবাইক নিয়ে বের হয়ে গেল। সুশান্তর মনে হয় ওরা কি একটা আলেয়ার পেছনে ঘুরছে।
এমনিতেই তাকে ওরা বলে, সে নাকি মেয়েছেলে। ওর মতো তার দাপট নেই। বিপিনদাই বলেছিল ওকে, ভালো করে লেখাপড়াটা শেষ করো শান্ত। মাথার উপর উঠতে গেলে বড়বড় ডিগ্রী কয়েকটা চাই। এদেশের মানুষ যতই অস্বীকার করুক, ওসব তাদের মুখের কথা। মনে মনে ওরা বিরাট ওই তক্‌মাধারী লোককে সমীহ করে শ্রদ্ধা করে। মাথার উপর উঠতে গেলে ওগুলোর দরকার। নইলে নিচের তলায় পড়ে থাকতে হবে। তুমি হয়ে থাকবে বুনিয়াদের ইট। প্রাসাদকে ধরে রাখে তারাই, তবু তাদের দেখা যায় না। কথাটা শুনেছিল সুশান্ত মন দিয়ে। তাদের বড় হতে হবে। কিন্তু বড় হওয়াটা কি তা সঠিক বুঝতে পারে না। বিপুলবাবুর অনেক টাকাকড়ি দেখেছে, শশধরবাবুর মতো সৎলোক, নিবারণবাবুর মতো পাণ্ডিত ব্যক্তির তুলনায় তার সম্মান খাতির এখানে অনেক বেশী। নিবারণবাবুও তো ডবল এম. এ.। কি পেয়েছেন তিনি।
কথাটা শুধোতে চেয়েছিল শান্ত বিপিনদাকে—সব কিছুরই দামের হের-ফের হয়েছে। নইলে নিবারণবাবু ওই সামান্য মাস্টারি নিয়ে পড়ে থাকছেন কেন? তিনি কেন বাড়িঘরও করতে পারেন নি? কিন্তু এই প্রশ্ন তার মনেই

রয়ে গেছে।

—কি শান্তবাবু!

চমকে ওঠে সুশান্ত। বিপিনদা নিচের ঘরে বসে কি সব কাগজপত্র দেখছিলেন। ওকে ডাকছেন। সুশান্ত দেখে, একটু আগেই মিলিদি ওকে চা দিয়ে গেছে। এতক্ষণ মিলিদিও বোধহয় এখানেই ছিল।

সুশান্তর মনে হয় ও বলে বসবে কথাটা। ওকে সাবধান করে দেবে—এ বাড়ির মানুষগুলোর সম্বন্ধে। বিপিনদা বলেন—এবার স্টার পেতে হবে কিন্তু। হেডমাস্টারমশাইও আশা করেন। আর হ্যাঁ—

সুশান্ত ওর দিকে চাইলো। বিপিনদা বলেন—ওসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডাটা একটু কমাও।

চমকে ওঠে সুশান্ত। আড্ডা সে বড় একটা দিতে যায় না। তবু বন্ধুবান্ধবদের এড়িয়ে থাকা যায় না। মিলিদিই বোধহয় ওকে তার সম্বন্ধে কিছু বলেছে।

বিপিনদা বলেন—বিশেষ করে ওই ফেলু কমলের দল, ওরা ডেঞ্জারাস ছেলে। ওদের পাত্তা দিও না।

সুশান্ত জবাব দেবার চেষ্টা করে—ওদের সঙ্গে মিশি না। সুশান্ত সরে এলো। মনে হয়েছে বিপিনদাকে সেও সাবধান করে দেবে, কিন্তু তার আগেই এসব শুনে একটু থেমে গেছে সে।

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ উঠছে। কাকামণি এসে ঘরে ঢুকেছেন। বোধহয় কোথায় বাইরে যাবেন তাঁরা। ওকে দেখেই কাকামণি বলেন—তুমি আবার এখানে কেন? পড়াশোনার সময়—কাকামণি ওকে দেখে খুশী হন নি। সেই ঘটনার পর থেকেই কাকামণি তাকে ভালো চোখে দেখেন না। হরিশমাস্টারও প্রায়ই আসে এখানে।

হঠাৎ এই সময়ই হরিশমাস্টারও এসে গড় হয়ে প্রণাম করে কাকামণিকে। কাকামণি বলেন—এত দেরি হলো?

হরিশমাস্টার গদগদ চিত্তে জানায়—পাঁচ দরজায় ঘুরে ঘুরে কদিন ধরেই

এসব সই করাচ্ছি ছোটবাবু। জানেন তো, নানান জনের নানা কথা। কেন—কি হবে—তার জবাব দাও তারপর শুনছি নিবারণবাবুও নাকি প্রতিবাদ করেছেন।

কাকামণির মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে—তাই নাকি!

হরিশমাস্টার গলা নামিয়ে জানায়—ওতে আটকায় নি। তিন চারশো সই এনেছি। এই যে—

একখানা দরখাস্ত আর বহুজনের সইকরা কাগজগুলো তুলে দিয়ে হরিশ-মাস্টার বলে চলেছে—দেখুন স্যার। কাজ ঠিক করেছি। তবে আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। মানে ওই ছেলেটার কথা বলছিলাম—লেখা-পড়া করলো না। যাহোক গাড়িটাড়ি হলে—মানে কোনো কাজকম্মো—

হরিশমাস্টারের দিকে চেয়ে থাকে সুশান্ত। লোকটা ভিখারীর মতো যেন কাঁচুমাচু করে ভিক্ষে চাইছে। আবার এই মানুষই অন্যত্র অন্য মূর্তি। বিপিনদা চুপ করে কি ভাবছেন। সেই হাসিখুশী ভাব তার মুখ থেকে মুছে গেছে। বললেন তিনি—সুশীলবাবু কি বললেন?

হরিশমাস্টারের কাছে ওরা সবাই যেন শত্রু। বলে সে—

—উনিই তোনাটের গুরু। বলেন পাকারাস্তার কনট্রাক্টি বাসরুটের পার-মিট—এ সবই তো পারেন ছোটবাবু। আর আমাদের কি জুটবে হে?

হরিশমাস্টার দাঁতপড়া মাড়ি বের করে হেঁ হেঁ করে হাসির মতো বিচিত্র একটা শব্দ করে যেন আশ্বাস দিচ্ছে।

—ও সব কথার হাঁড়ি, কাজের অষ্টরম্ভা। যেতে দিন না। এ সব এলাহি কাণ্ড হতো আপনি না থাকলে? ছোটবাবু তাইতো বলেন—একটা কর্ম-বীর হে!

কাকামণি পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে হরিশমাস্টা-রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—পরেদেখা করো মাস্টার। চলো হে বিপিন, আবার ওদিকে দেরি হয়ে যাবে বাস ধরতে।

গরুর গাড়িতে করে ওঁরা বের হয়ে গেলেন কান্দী শহরের দিকে। ওখান

থেকে বাসে করে সদরে যেতে হবে কি জরুরী কাজে।

হরিশমাস্টার এসে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ সুশান্তর দিকে নজর পড়তে চমকে ওঠে। বসন্তবাবু হরিশমাস্টারকে এই জনসাধারণের দাবিসূচক দরখাস্তে সই করবার জন্য বলেছিল, বাসের জন্য ওদের সকলেরই দরকার। আসলে ওটা বসন্তবাবুর নিজের স্বার্থে লাগানো হবে। তা ছাড়া বসন্তবাবুও জানেন গ্রামে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লোকও মাথা তুলছে। এতদিন বিপিনবাবুর একটা দল নিয়েই চলছিল, এবার মধুর লোভে অনেকেই জুটতে চায়। তাই মাথা তুলছে দু'একজন। বসন্তবাবু সেই খবরাখবরগুলোর জন্য হরিশমাস্টারকে হাতে রেখেছেন কিছু টাকার বিনিময়ে। ওর সেই আত্মবিক্রয়ের বেদনাভরা রূপটাকে দেখেছে সুশান্ত।

হরিশমাস্টার অবশ্য বহুরূপী। তৎক্ষণাৎ তার সেই কঠিন সত্ত্বাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শাসন-কঠিন সুরে বলে হরিশমাস্টার—পড়াশোনা নেই তোর? এখানে কি করছিস?

সুশান্ত অবাক্ হয় না। সে-ই এই মুখোশধারী জীবগুলোকে একে একে চিনছে বহু বেদনায়। বেদনাটা এই জন্য যে অনেক বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার মিনারগুলো তার চোখের সামনে ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এতদিনের সত্যগুলো যেন মিথ্যায় পরিণত হচ্ছে। একটা ঘৃণ্য স্বার্থের কাছে এরা অনেক কিছুকেই বিসর্জন দিচ্ছে।

হরিশমাস্টার ধমকায়—যত্তোসব বাঁদর কোথাকার। পড়াশোনায় মন দে গে!

সুশান্তর হাসি আসে। মনে হয় খড়মোড়া একটা কাকতাড়ুয়া যেন বেগুনক্ষেতে দাঁড়িয়ে কাল্পনিক হাত পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভয় কিছুই থাকতে পারে না।

বের হয়ে এলো সে। সুশান্তর মনের সব ধারণা গুলো ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে।

শমীকই আশ্বাস দিয়েছিল মেয়েটাকে, বি. ডি. ও. সাহেব তার বিশেষ পরিচিত। তাকে বলে মিনতির একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ক্লাস এইট্ অবধি পড়ার সার্টিফিকেটও যোগাড় করেছে সে।
শমীক গার্লস স্কুলে ঢুকে গিয়ে হেডমিস্ট্রেসকে বলে ওকে সার্টিফিকেট দিতে হবে যে ক্লাস এইটে পড়ে। মিনতিও সঙ্গে গেছে। আজই বি. ডি ও. সহেবের ওখানে যেতে হবে তাদের ওই সার্টিফিকেট নিয়ে।
বড় দিদিমণি মিনতিকে চেনেন। এর মধ্যেই মেয়েটা যেন বদলে গেছে। স্কুলে মাইনেপত্র দেয় না। পড়াশুনার দিকেও মন নেই। কোনোদিন আসে কোনোদিন আসে না। স্কুল পালিয়ে কোথায় আড্ডা দিতে চলে যায়। এসব কথা কানে আসে।
আজ শমীককে ওর সঙ্গে দেখে অবাক্ হন তিনি। বলেন ও ক্লাস সেভেনে ফেল করেছে এবার।
শমীক জানায়—ক্লাস এইটে পড়ে এইটা লিখে দিন, একটা চাকরি হয়ে যাবে ওর ।
—মিছে কথা বলতে হবে? বড় দিদিমণি কড়া স্বরে জানান। শমীক ওর দিকে চাইল। বলে সে—ওর উপকার হবে। অবশ্য আপনি না করলে বিপুলবাবুকেই বলবো গিয়ে। সেটা কি ভালো হবে?
বড় দিদিমণি একটু অবাক্ হন। মিনতি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কেরাণী-বাবুও ব্যাপারটা দেখে বড় দিদিমণির কানে কানে কি যেন বলতে তিনি জানান। —যা ইচ্ছে করুক গে।
শমীক হাসছে বিজয়ীর হাসি। মিনতিও অবাক্ হয় শমীকের এই সাহসে। ওর সার্টিফিকেট পেতে দেরি হয় নি। বের হয়ে মটরবাইকটা নিয়ে চলেছে তারা। কয়েক মাইল পথ পার হয়ে কান্দী আর সাঁইথিয়ার রাস্তার মোড়ে নতুন করে গড়ে উঠেছে ওই ব্লক ডেভালাপমেণ্ট অফিস? ভেটারনারি অফিস,ল্যাণ্ড-রেকর্ডস আপিসগুলো।
এককালে ওখানে ছিল একটা ডাকবাংলো। গাছ-গাছালির ছায়া নিবিড়

দীঘির ধারে নতুন গড়ে ওঠা এই জনপদে আজ বিচিত্র জীবনের সাড়া এসেছে। ওপাশে গড়ে উঠছে ধানকল। বসন্তবাবুদের এইখানে অনেক পতিত জমি ছিল। সেগুলো আজ চড়া দামে বিকুচ্ছে। শমীকরাও একটা অফিস মতো গড়েছে, ওদের ঠিকাদারীর অফিস। মালপত্র, লোকজন থাকে।

…এখন জীর্ণ ওই ধ্বসেপড়া জমিদার গোষ্ঠীর খোলস ফেলে নতুন কর্মব্যস্ত একটা জীবন গড়ে উঠেছে নতুন রূপে। এই জায়গা ওই এলাকার সব পথগুলোর মুখে। তাই এই জনপদ গড়ে উঠেছে। বিপিনবাবুদেরও ডেরা রয়েছে এখানে। কর্মীরা এসে জমায়েত হয়। হাটের দিন আসে হাজার হাজার মানুষ। ফাঁকা মাঠগুলো ভরে ওঠে তাদের ভিড়ে।

মিনতির কাছে এই নতুন জগতের নেশা কি বিচিত্র আবেশ আনে। মটরবাইকটা চলেছে। বাঁ হাত দিয়ে শমীককে জড়িয়ে রয়েছে সে। ওর নিটোল নরম দেহের ছোঁয়া লাগে শমীকের গায়ে। বাতাসে উড়ছে মিনতির শাড়ির আঁচল, চুলগুলো উড়ে এসে পড়ে। মাঝে মাঝে কি একটা আবেশ আর ভয়ে শিউরে ওঠে সে। মিনতি কলকণ্ঠে বলে—এ্যাই! একটু আস্তে চলো না! ভয় করছে যে! ভয়! শমীক ইচ্ছে করেই স্পীড বাড়িয়ে দেয়। ঝাঁকুনিতে কাঁপছে মিনতির সারা দেহ। মনে হয় এমনি করেই প্রচণ্ড গতি নিয়ে সে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে।

শমীক সেই উত্তাল মনোজগতের সঙ্গী।

মিনতিকে এমনি করেই শমীক যেন জালে জড়িয়ে ফেলেছে। ব্লক অফিসার চেনেন শমীককে। ওরাই আগামী দিনের মানুষ। এই এলাকার নামী বংশের ছেলে। শমীক বলে—এর কথাই বলেছিলাম আপনাকে। কাগজপত্র সব এনেছে।

মিনতি দেখছে চারিদিক। ছোট ঘরখানায় তরুণ বি. ডি. ও. সাহেব বসেন। ওরই মধ্যে ছিমছাম করে সাজানো। মিনতি বসলো।

—ফর্মটাতে সই করুন।

মিনতি সই করছে শমীকও তাকে অভয় দেয়।
—এখানের হাসপাতালেই ট্রেনিং নেবে। দেখবেন একটু চেষ্টা করে স্যার। সবই তো আপনার হাতে।
ব্লক অফিসার সাহেবও বুঝে নিয়েছেন তাঁকে, এখানে থেকে চাকরি করতে গেলে এদের চটানো নিরাপদ হবে না। সদরেও নেতাদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তাছাড়া একটা সমাজ মাথা তুলেছে, সেই নতুন সমাজে এদেরই প্রাধান্য। বিপিনবাবুও আছেন এদের দলে। নইলে এত বড় রাস্তার কনট্রাক্ট বাস রুটের পারমিট এসবগুলো এদের হাতে পাকা ফলের মতো টুপ করে এসে হাতে পড়তো না। এদের তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাধ্যও তাঁর নেই। তবু বলেন তিনি—আমার চেষ্টার অভাব হবে না ; কিন্তু জানেন তো সদরে ডি এম. ও. অফিসের ব্যাপার।
শমীক হাসছে, ধানাই পানাই করছেন কেন স্যার। ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বুঝলেন তো !
শমীক কি যেন বলতে চায়। ব্লক অফিসার চুপ করে থাকেন। এসব ব্যাপার তাঁর ভালো লাগে না।
শমীক আর মিনতি বের হয়ে এই দীঘির ধারে বাংলোয় এসে বসেছে। কিন্তু ছপুর তখনও হয়নি। ছায়া ছায়া রোদ বাগানের সমতল মাটির বুকে লুটিয়ে পড়েছে। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশে পাখী ডাকছে। মিনতির ছচোখে কি একটা ছর্বার নেশা। এই চাকরিটা তার চাই। বাড়ির হতদরিদ্র অবস্থার কথা সে জানে, আর সেটা তার কাছে ছর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মিনতি শুধায়—চাকরিটা হবে তো ?
শমীক ওকে দেখছে। ছায়া-রৌদ্রমাখা স্বপ্নজগতের অসীমে এই পাখী-ডাকা স্নিগ্ধতার মাঝে সে কোথায় হারিয়ে গেছে। ওর হাতখানা মিনতির হাতে। সারা দেহ মনে একটা সাড়া জাগে শমীকের। মিনতি ওই চাহনির অর্থ জানে। তার সত্তজাগর মন পুরুষের ওই আহ্বানের সুর শুনেছে।

—এ্যাই ! মিনতি হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করে।

শমীক ওকে কাছে টেনে নেয়। হাসছে মিনতি—ওর মাংসলদেহের সোচ্চার রেখায় শমীক দেখেছে কি বুভুক্ষু মনের নির্লজ্জ আবেদন !

মিনতি সেই বিচিত্র জগতের নেশায় তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। মিনতিও চায় ওদের মতো জীবকে এই সামান্য প্রলোভন দেখিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে। এটা তার কাছে যেন একটা খেলা মাত্র।

বলে ওঠে মিনতি—চলো, ফিরতে হবে না ?

শমীক হাসছে। শোনায়—নাই বা ফিরলে? আজ দুপুরটা এখানে কাটিয়ে বৈকালে ফিরবো।

—খুব সাহস তোমার ! বাড়িতে কি বলবো ?

—চাকরির ব্যাপারে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

শমীক যেন ওকে বুদ্ধি যোগাচ্ছে। মিনতি এসব জানে ! তবু নিজের দাম আর মর্যাদা বাড়াবার জন্য বলে—মা ভাববে।

শমীক বাধা পেয়ে দুর্বার হয়ে উঠতে চায়। এ তার সদ্যজাগর পৌরুষ। এই কাঠিন্য নিয়ে সে সবকিছু দখল করতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায়। ওর বলিষ্ঠ দু হাতের বাঁধনে ওই প্রকল্প নরম দেহটা যেন কোনো এক বিচিত্র বর্ণময় নেশার জগতে হারিয়ে যায়।

·

এই নেশা, এই স্বপ্ন কৈশোর আর যৌবনের সন্ধি লগ্নের স্বপ্ন। এইখান থেকেই তার শুরু। যৌবনের পথ বেয়ে সেই স্বপ্ন-মন পার হয়ে যায় প্রৌঢ়ত্বের দিকে—একদিন শেষ হয়ে যায়। মানুষ সেদিন হয়ে ওঠে নিঃস্ব, রিক্ত ! সাধারণ মানুষের জীবনে এইটাই সহজ এবং গতানুগতিক ধারা। এর ব্যতিক্রমও আছে। জীবন সেখানে বেদনায় নীল, প্রতিজ্ঞায় কঠিন, কর্তব্যে স্থির ; পাওয়ার সেখানে কোনো হিসাব নেই, লাভক্ষতির হিসাবও মেলে না। সে জীবনের কষ্টকেই মেনে নিয়ে খুশী হয়েছে। বাহ্যিক পাওয়ার লক্ষণ নেই—তাই সে দরিদ্র। হয়তো অনেকে তাকে অনুকম্পা করে।

কিন্তু যাকে ঘিরে এই দয়া আর অনুকম্পা সে কিন্তু এটাকে গায়ে মাখে না। তার নিজের অন্তরের কোনো গোপন ঐশ্বর্যে সে মহীয়ান।

সুশান্ত এই দ্বিতীয় জগতটাকে চিনতো না। কারণ তার চারিপাশের মানুষগুলো, যাদের সে দেখেছে, যাদের মধ্যে বাস করেছে, তারা কমবেশী পেতে চায়, সুখী হতে চায়, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার জন্যই তাদের সব চেষ্টা আর পরিশ্রম। সেই পাওয়ার স্বপ্নকে ঘিরেই তাদের সকল কর্মকাণ্ড।

সেটা দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সুশান্ত।

বিপিনদাকে তবু অন্য পর্যায়ে ফেলেছিল সে।

দেখেছে ছেলেবেলা থেকে ওই ছেলেটিকে। জেলে গেছে, অত্যাচার সহ্য করেছে একটা মহৎ আদর্শের জন্য। বন্যায়, মহামারিতে, দাঙ্গায় বুক পেতে এসে দাঁড়িয়েছে দুঃখ-প্রপীড়িত মানুষের মাঝে। নিজের কথা সে ভাবে নি। কিন্তু আজ সেই সংগ্রামের মাঝে দেখা মানুষটির উজ্জ্বল মূর্তিটা কেমন আবছা হয়ে আসে।

সুশান্ত কথাটা ভেবেছে বার বার। কাকামণি, ওই শমীক, বিপুলবাবু কী একটা আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছে। মায় ওই হরিশমাস্টার অবধি। দিদিও কি পেতে চায়! তাই সে বিপিনবাবুর মতো লোকের মনের অতলে একটা নতুন চেতনাকে জাগিয়েছে।

সুশান্ত দুঃখ পেয়েছে মনে মনে। তাহলে সত্যিকার মানুষের পরিচয় কি থাকবে। সবই কেবল মুখোশপরা নীতিবাদের বচন ওড়ানো কতকগুলো কাকতাড়ুয়ার দল!

বের হয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। বেলার রোদ হলুদ থেকে অভ্র রং ধরেছে। গ্রামের এদিকটা নির্জন। পিছনে ছোট ইস্কুলের আজ ছুটি। ছায়াঘেরা সেই খাড়া লম্বা ঘরটায় ছেলেদের কলরব নেই। সামনে ময়ূরাক্ষীর বালুচর। রূপোলী বালুচরে শীত শেষের নদী যেন ঘুমিয়ে আছে। দূরে বালির বুক

চিরে ছোট একটু জলস্রোত ওর পরিচয়টুকু নিয়ে কোণঠাসা হয়ে আসে, দরিদ্র উপবীত সর্বস্ব ব্রাহ্মণ যেমন করে বড়লোকের বৈঠকখানার এককোণে বসে থাকে, জমিদারবাবুর দয়ার প্রত্যাশী হয়ে—এ যেন তেমনিই।

—কোথায় চলেছো ইয়ং বয়।

হঠাৎ নিরারণবাবুর ডাকে চমকে ওঠে সুশান্ত। স্কুলের মাস্টার নিবারণবাবু থাকেন নদীর ধারে একটা নির্জন খড়ো বাড়িতে। মাঝেমাঝে ওঁকে দেখা যায় বৈকালে একাই নদীর চরে কাশবনের পাশ দিয়ে চলেছেন। কখনও বা দেখা যায় ওই ঘরের দাওয়ায় বসে কি লিখছেন। বোধহয় কোনো গরীব চাষীর কোনো দরখাস্ত, না হয় তাদের সঙ্গে চলেছেন দারোগাবাবুর কাছে, না হয় ডাক্তারের কাছে তাদেরই হয়ে কিছু আবেদন নিবেদন করতে। বয়স হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো প্রায় সাদা হয়ে গেছে। তবু বলিষ্ঠ দেহ —কোথাও ওই কাঠামোটার বয়সের ভারের চিহ্ন ফুটে ওঠে নি।

ওঁকে অনেকেই' এড়িয়ে চলতো। সুশান্তর ওঁকে বড় ভালো লাগে—কিন্তু সেই ভালোলাগার সঙ্গে একটা সমীহ আর আতঙ্কের ভাবও যেন মেশানো ছিল।

নিবারণবাবু বহু বছর আগে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়েছিলেন, আর সেটা ছিল অগ্নিযুগের সময়। তাই তিনিও ঢাকার ওদিকে কয়েকটা বিপ্লবীদের ব্যাপারে ছিলেন অন্যতম নেতৃস্থানীয়।

সেই অপরাধে দীর্ঘদিন কারাবাস করার পর মফস্বলের থানায় থানায় অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয়েছিল। সেই অন্তরীণ হয়েই ছিলেন এখানের থানায়। মুক্তি লাভ করার পরও আর দেশে ফিরে যান নি। এই পল্লীঅঞ্চল-কেই নিজের দেশ বলে মেনে নিয়ে এখানেই রয়ে গেছেন নিবারণবাবু।

এগিয়ে গেল সুশান্ত। প্রণাম করতে হয় তাঁকে। সৌম্য সুন্দর লোকটি ওকে কাছে টেনে নেন। বেড়া-ঘেরা জায়গাটা গাঁদা, জিনিয়া, ডালিয়া, অতসী ফুলে ভরা। ছোট তপোবনের শান্ত ভাব এসেছে সেখানে। সামনেই নদীর বিস্তার।

সীমাহীন বিস্তীর্ণতার মাঝে তিনি যেন ধ্যানের আসন পেতেছেন।
এখানে কলরব কোলাহল নেই। আলোর বন্যায় সব ধুয়ে মুছে গেছে।
—পাস করে কি পড়বে?—কি হতে চাও! ইউ মাস্ট হ্যাড সাম্ আইডিয়া।
ওঁর দিকে চাইলো সুশান্তও। বাবাও একটা পরিকল্পনা করে রেখেছেন।
সুশান্তও ভেবেছে কথাটা। একটা স্বপ্ন তার রয়ে গেছে সে হবে গুণী জ্ঞানী।
ডাক্তারীর কথাও বলেছিলেন বাবা। কিন্তু তার ওই জীবন ভালো লাগে না। কাটা ছেঁড়া করতে হবে। আর দেখেছে ডাক্তারদের—এতই কাজে ডুবে থাকতে হয় টাকার জন্য, লোকের তাগিদে যে নিজের সময় কিছুই থাকে না।

তার নিজের মাসী লতিকাকে দেখেছে। সদরের ডাক্তার, ওরা স্বামী-স্ত্রী তুজনে। মাঝে মাঝে সুশান্ত গেছে তাদের ওখানে। দেখেছে কেমন ছন্নছাড়া সংসার। তুজনে তুদিকে রোগী নিয়েই ব্যস্ত। আর যখনই একটু ফুরসৎ পেয়েছে, বসেছে ওই রোগ আর রোগীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে। রাত তুপুরে কেউ দৌড়লো হাসপাতলে—সে যেন একটা বিশ্রী জীবন।

দেখেছিল ওদের ওখানেই এক ভদ্রলোককে। কলেজের নামকরা অধ্যাপক। সৌম্যসুন্দর হাসিখুশী চেহারা। সঙ্গে তু চার জন তরুণ রয়েছে। ভদ্র লোকের বাড়িতেও গেছে সুশান্ত। বই আর বইয়ে ঠাসা ঘর আলমারি। তাঁর নিজের গড়া একটা বিচিত্র জগতের তিনি সম্রাট।

সেই আলোকোজ্জ্বল ছবিটা ভোলে নি সুশান্ত। মনে মনে তার নিজের জীবনের ছকটাও আঁকা হয়ে গেছিল। সুশান্ত সেই ছবিরও রূপান্তর দেখেছে নিবারণবাবুর জীবনে। কঠিন একটি মানুষ। অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার। যৌবনের যে কাঠিন্য আর শপথ নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে ছিলেন, সেই কাঠিন্য আজও মুছে যায় নি। ত্যাগ আর সেবার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

সুশান্ত বলে—অধ্যাপক হবো আমি।

নিবারণবাবুর চোখতুটো খুশীতে ঝকমক করে ওঠে। বলেন তিনি—ভালো,

খুব ভালো। বুঝলে—সবাই সায়েন্স নিয়ে কেবল ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে শুধু রোজগার করতে চায়। নিজের স্বার্থ দেখতে চায়। কিন্তু একটা জাতকে গড়তে হবে। তার জন্য চাই শিক্ষক। কিন্তু সেই দিকে কারোও নজর নেই। এরা বলে সায়েন্স তারপর হিউম্যানিটিস! কিন্তু এই পক্ষপাত-দুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে এরা বেবিক্যাল হিউম্যান ইনস্‌টিংক্ট অর্থাৎ মানবিকতাকেই সবচেয়ে বেশী অপমান করেছে। ফলে আজ সবই হয়েছে সুশান্ত, কলকারা-খানা ব্যারেজ, বাঁধ, রাস্তা অনেক কিছু, হয় নি শুধু মানুষ তৈরি।

সুশান্ত ওঁর কথাগুলো শুনছে। ওঁর কণ্ঠস্বরে কি একটা কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। নিবারণবাবু বলেন—শুধু মানুষ নামক জীবে পরিণত হয়েছি আমরা। স্বার্থ সংঘাত আর বঞ্চনায় ভরে উঠেছে সারা সমাজ। দেশকে নতুন করে গড়ার জন্যই সব ত্যাগ করে ওই পথে নেমেছিলাম, কিন্তু তখন ভাবি নি—এই রূপান্তর ঘটবে।

শূন্য বালুচরে রোদ জ্বলে উঠেছে। হুহু হাওয়া ওঠে। দূরে ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশে দু'একটা চিল পাক দেয়, আকন্দ ফুলের উপর ভ্রমরের কালো বিন্দুটা সজীব হয়ে ওঠে।

নিবারণবাবু বলেন—মাঝে মাঝে সব আশা আশ্বাস হারিয়ে ফেলি সুশান্ত। মনে হয় সব কি মিথ্যা হয়ে যাবে? তবু—

নিবারণবাবু দূরের দিকে চেয়ে থাকেন, ওর আশাহীন মনে কোথায় যেন আশার সুর তবু ওঠে। তিনি বলেন—তবু একালের যৌবনকে আমি বিশ্বাস করি, আশা রাখি। অনেক যন্ত্রণা, অনেক দুঃখ আর ব্যর্থতা পার হয়ে সে নিজের দেশকে চিনবে। একটি উজ্জ্বল স্বপ্নকে সত্য করবেই। সেই সার্থক দিনকে দেখে যেতে পারবো কিনা জানি না।

নিবারণবাবুর মনের এই দিকটাকে এত কাছ থেকে কোনো দিন দেখে নি সুশান্ত। এই রূপটা তার চোখের সামনে কি ঔজ্জ্বল্য এনেছে। ওর মনের পটে তেমনি একটি সুন্দর বর্ণময় ছবি আঁকা হয়ে ওঠে। ভোরের প্রথম আলো-জাগা আকাশের মতোই এই ছবিটা বর্ণময়। আর পাখীর কলকাকলিমুখর

সম্ভাবনাময়।
নিবারণবাবু বলেন—তুমি সার্থক হও সুশান্ত। মনে রেখো, সত্যই একমাত্র আলো। সেই আলোতেই সব অন্ধকারের মাঝে পথ চিনে নিতে হবে।

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু।
ইদং সত্যং, ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্মঃ ॥

ঠিক কথাগুলো বুঝতেপারে না সুশান্ত। তবু ওর সারা মনে একটা আলোড়ন ওঠে। এতকালের দেখা শোনা সব কিছু আজ যেন নতুন করে যাচিয়ে নিতে চায় সে।

বেলা হয়েগেছে। নদীর দিক থেকে ফিরছে। আখের ক্ষেতগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। অধিকারিদের বাগানের ওখানে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো সুশান্ত। কাদের কলরব উঠছে।
—এই। বালির উপর দিয়ে ছুটে আসছে কেয়া। শাড়ির আঁচল উড়ছে, ওর দেহের রেখাগুলো পরিস্ফুট। কি সুঠাম ছন্দ মাধুর্যে ভরে দিয়েছে ওর দেহ। কেয়া হাঁপাচ্ছে ওই বালি ভেঙে এসে। গালদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। বলে ওঠে—বাব্বা! আচ্ছা ছেলে যাহোক। দেখাই নেই। কাল গেছলাম, আজও গেলাম তোমাদের বাড়িতে, দেখাই নাই বাবুর।
ওকে এখানে দেখে অবাক্ হয় সুশান্ত—কেন?
—বা রে। আজ পৌষল্লা আমাদের। তোমাকে নেমন্তন্ন করতে গেছলাম। তা দেখাই পেলাম না। চলো।
ওর হাতটা ধরেছে কেয়া। নরম উষ্ণ স্পর্শ ওর দেহে কি চমক আনে। কেয়া তাকে ওই রৌদ্র-উজ্জ্বলজগতের পথে যেন নিয়ে চলেছে কোনো ফুলফোটা জগতের সন্ধানে। আকন্দ ফুলেরবন এখানে। কালো ভ্রমরগুলো গুনগুনিয়ে উঠছে। বালুচরে কোথায় জাগে কাদাখোঁচা স্নাইপের দল। সুশান্ত ওর হাত ধরে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে চলেছে।
সিনেমায় দেখা সেই ছবিটার কথা মনে পড়ে। বিস্তীর্ণ বালুচর, কাশ-

ফুলের পালা ফুরিয়েছে। বিবর্ণ কাশবনে বাতাস কি রিক্ততার সাড়া আনে। নীল আকাশে সাদা মেঘগুলো নিরুদ্দেশের পথে ভেসে ভেসে চলেছে। কেয়া দৌড়চ্ছে। ও যেন ডাকছে সুশান্তকে।

—এ্যাই। ধরো আমাকে। দৌড়োও!

সুশান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপ করে। কোয়ার ওই উপছে পড়া খুশীর জগতে সে যেন সামিল হতে পারে না।

—কি হল আবার? কেয়া একটু অবাক্ হয়। ওর কাছে এসে দাঁড়ালো। সুশান্ত নির্বাক চাহনিতে ওর দিকে চেয়ে আছে। এই নদীতীর, বালুচর —ওই নীল আকাশে হারিয়ে যাওয়া মেঘগুলো—ওই কেয়া সব যেন তার কাছে স্বপ্নে দেখা একটি স্মৃতিমাত্র। বাস্তবে কোথাও তাদের ঠাঁই নেই। আছে শুধু অসীম শূন্যতা। ওরা শুধু হারিয়ে যায়।

—কী ভাবছো? কেয়া ওর কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর নরম কবোষ্ণ দেহের নিবিড় ছোঁয়া লাগে সুশান্তর দেহে। একটা নীরব উত্তাপ তার সারা দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। সেই আবেশটুকু অনুভব করে কেয়া। তার দু চোখে নীরব একটা মিনতি।

বলে সে—তুমি সত্যিই বিচিত্র, কেমন খাপছাড়া!

সুশান্ত জানে না, মাঝে মাঝে সে এমন কি ভাবনার অতলে হারিয়ে যায়। মনের জগতে যে আলোকোজ্জ্বল অনুভূতিগুলোর ছবি হয়ে ফুটে ওঠে, তার কোনো বর্ণনা সে দিতে পারে না। কেয়া হয়তো হাসবে। কেয়ার কল্পনায় তেমনি কোনো জগতের হিসাব নেই ও এইটুকু নিয়েই তৃপ্ত, চোখের দেখা জগতকে সে তার নিজের পাওয়ার বর্ণে বর্ণময় সজীব করে তুলেই সুখী থাকতে চায়। সুশান্ত বলে—হয় তো তাই।

কেয়া বলে—মা কি বলে জানো?

—কি? সুশান্ত শুধালো। কেয়া বেণীটাকে ঘাড় কাত করে জড়াতে থাকে, ওর শাড়ির আঁচলটা উতলা বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। দেহের নিটোল পূর্ণতার রেখাগুলো যেন সোচ্চার! কেয়ার চোখে হঠাৎ কি ধারালো ভাব

ফুটে ওঠে—এ্যাই ?

শাড়িখানা বুকে গায়ে জড়িয়ে দাঁত দিয়ে টিপে ধরে খোঁপাটাকে দুরস্ত করতে থাকে। হাসছে কৌতুকময়ী বিচিত্র একটি নারী। এই কেয়াকে সে চেনে না।

কেয়া এই রূপটাকে যেন ঢেকে ফেললো। সহজ কণ্ঠে বলে—ছেলেবেলায় মা মারা গেলে বাবার কাছ থেকে সরে অপরের কাছে থাকলে সে নাকি এমনি হয়ে ওঠে।

সুশান্ত ওসব ভাবে নি। তবে মনে হয় তার মনের মাঝে একটা শূন্যতা রয়ে গেছে, যা স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। তাই হয় তো একটা বিকৃতিই রয়ে গেছে সেই শূন্যতা জুড়ে।

কেয়া বলে ওঠে ধমকের সুরে—চলো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ওরা আবার খুঁজবে।

কম্পা ফেলু প্রভাত ওরাও সুশান্তকে দেখে কলরব করে ওঠে—তুই চলে আয়, বসে পড়। কই পিসী, শান্তকে জলখাবার দাও।

কেয়ার মাও সুশান্তকে দেখে হাসলো একটু। তরকারি কোটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে। ফেলুর পিসীমা সুশান্তকে দেখে খুব খুশী হয় নি। তবু বিরক্তি চেপে শালপাতার ঠোঙায় আলুর চপ আর মুড়ি এনে দেয়।

নদীর কাজলকালো জলে সাঁতার কেটে গান গেয়ে বালিতে কপাটি খেলে দিনটা কোন্ দিকে হারিয়ে গেল বুঝতে পারে না সুশান্ত। বৈকাল নামছে। ওদের এবার ঘরে ফেরার পালা।

দিনটা কোন্ দিক দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারে না সুশান্ত। একটি আলোভরা দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে।

ওরা ফিরে আসে গ্রামের দিকে। পাখীগুলো অধিকারী পুকুরের বাগানে কলরব করছে। নদীর নির্জন বিস্তারে ধোঁয়াটে কুয়াশার চাদর জড়ানো। সুশান্ত চুপ করে সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতাকে অনুভব করে।

কেয়া বলে—দিনটা বেশ কাটলো, না ?

সুশান্ত আর কেয়া এগিয়ে এসেছে আলপথ ধরে। সুশান্ত ওর কথায় কেয়ার দিকে চাইলো। কেয়ার চোখে একটি স্বপ্নের নীরবতা।

ফেলু বলে ওঠে—তা কাটবে না ? সুশান্তও তক্কে তক্কে ছিলি, নারে ? সটান এসে জুটেছিলি !

সুশান্ত জবাব দিতে গিয়ে কেয়ার ইশারায় থামলো।

কেয়া জানে ফেলুর এই উষ্মার কারণ। তাই এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চায় না সে।

দু' একটা তারা জ্বলে উঠেছে। কেয়া বলে শমীককেও বলেছিলাম আসতে, সে এলো না।

কম্পা শোনায়, সে তো মিনতি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শালা আবার লগন-চাঁদা মাইরী। বাপের পয়সা আছে নিজেরও মটরবাইক আছে ! ওড় ব্যাটা ! এন্তার উড়ে যা।

ফেলু যোগান দেয়—আর শান্তই বা কমতি কিসে র‍্যা !

ওদের এইসব আলোচনা ভালো লাগে না। শান্ত সরে এলো। কেয়াও যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। সুশান্তকে আজ সেইই ওদের এই বিশ্রী সমালোচনার মধ্যে এনে ফেলেছে। প্রভাত বলে—কি হচ্ছে ফেলু ! দু'একদিনের মধ্যেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে। এখন ওসব ভালো লাগে না।

ফেলু হাসে—ওসব তোরা ভাববি, গুড বয়, আমরা শালা ফেল করতেই আছি।

কেয়া ওকে এগিয়ে দিতে এসেছে ভাঙা বাড়িটার এদিকে। অন্ধকার এখানে জমাট বেঁধে আছে। দু-একটা চামচিকে ভাঙা বাড়িগুলোর কোণ থেকে বের হয়ে উড়ছে। কেয়া থমকে দাঁড়ালো। বলে সে—রাগ করেছো ? সত্যি আমি ভাবি নি ওরা এইসব কথা বলবে।

সুশান্ত হাসলো মাত্র। ওদের দু'জনের মনের অতলের সুপ্ত জগৎটাকে ওরা

আরও কাছে এনে দিয়েছে। সুশান্ত বলে—না। রাগ কেন করবো।

হঠাৎ কার গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো তারা। শমীক আর মিনতি অন্ধকারে দুটো ছায়ার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তারার আলোয় ওদের দেখে শিউরে ওঠে সুশান্ত। কেয়াও অজানা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওরা দুজন দুজনকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। মিনতি কি প্রতিবাদ করতে চাইছে। শমীক ওর সব বাধাকে তুচ্ছ করে ওকে যেন পিষে ফেলতে চায়।

অন্ধকারে একটা খটাসের চোখ জ্বলছে। নীলাভ হিংস্র সেই চাহনি মেলে এ বাড়ির কোন্ প্রেতাত্মা যেন দেখছে ওই কুৎসিত দৃশ্যটা। মিনতির সব প্রতিবাদ কোথায় হারিয়ে গেছে। শমীক বিড়বিড় করে—টাকা, চাকরি কে দেবে তোকে! সব পাবি। মিনতি···মিনু।

কেয়া অন্ধকারে চকিতের মধ্যে সরে যায়। ভয়ে পালাচ্ছে সে। কি যেন দুস্তর লজ্জা ছেয়ে ফেলেছে তার মুখের হাসিকে। পুরুষের নির্লজ্জ হিংস্রতায় কুমারী মন আজ কি ভয়ে শিউরে উঠেছে।

সুশান্ত যৌবনের এই লোলুপ পাশবিকতাকে প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে আঁতকে চমকে উঠেছে।

কাছারিবাড়িতে একটা ছোটখাটো উৎসবের সমারোহ চলেছে। বিপুলবাবুও এসেছেন। এসেছে হরিশমাস্টার। কাকামণি আজ বোধহয় খোস মেজাজে আছেন। বিপিনবাবুও কি বলছেন। বাতাসে মাংসের খোসবু উঠছে। শশীঠাকুর কাছারিঘরের ওপাশে রান্নার জায়গায় মাংস আর বোধহয় পোলাও চাপিয়েছে। ওঁরা ছাড়াও দু-চারজন ভদ্রলোক আছেন। সদরের কোনো কর্তাব্যক্তি, ব্লক অফিসের সাহেব, থানার কর্তারাও এসেছেন।

বসন্তবাবুদের নতুন ঠিকাদারীর কাজে এবার বেশ লাভ হয়েছে। তাছাড়াও আজ বিরাট একটা কাজ আবার পেয়েছেন। ওদিকে নতুন রাস্তায় বাস পারমিটও এসে গেছে। বসন্তবাবু আর বিপুলবাবুদের যৌথ নামে। সেই

সবের জন্য উৎসবের আয়োজন চলেছে।

এবার বসন্তবাবু গুছিয়ে বসেছে, তাই প্রতিপক্ষ সুশীলবাবু আর তার পরামর্শদাতা নিবারণবাবুকে সমঝে দিতে চান যে তিনিই এখানের একমাত্র দেশপ্রেমিক আর জননেতা।

হরিশমাস্টারই জানায়—নিবারণবাবু ছেলেদের মাথাগুলো চিবোচ্ছেন স্যার। বলবো কি, আপনার ভাইপোটি ওই সুশান্তও যায় সেখানে।

চমকে ওঠেন বসন্তবাবু।—মানে! শান্ত ওই নিবারণের কাছে যায়?

সুশান্ত ততক্ষণে কাছারিবাড়ির বারান্দায় এসে উঠেছে। থামের একপাশে এসেই ওই কথাটা শুনে অবাক্ হয়। আজই গিয়েছিল ওদিকে। সেই খবরটা এসে পেঁ ৗছেচে এখানে। তা ছাড়া নিবারণবাবুর কথায় সে খারাপ কিছুই দেখে নি। তাঁর কাছে স্বাধীনতার যে স্বপ্ন ছিল আজ তা স্বার্থক হয় নি। কেন এই অবক্ষয় তা তিনি দেখেছেন। দেখেছেন সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষ আজ ভাগ্যের শিখরে উঠেছে। তাঁর সর্বস্বত্যাগী মানবদরদী মন এই স্বার্থপরতায় বেদনা বোধ করবে এটাই স্বাভাবিক এবং সহজ সত্য। কিন্তু এটাই এদের স্বার্থের পরিপন্থী। নিবারণবাবু তাই এদের চোখে শত্রু বলেই গণ্য। সর্বহারা মানুষের জন্য তিনি বলেন, এই তাঁর অপরাধ।

দারোগাবাবুও কথাটা শুনে বলেন বসন্তবাবুকে।—ওই সব ইয়ংম্যানদের মনে রোমান্স মানে কিছু করার স্বপ্ন থাকবেই। ওঁরা তাঁদের চোখে নানা স্বপ্নের মোহ গড়ে তাদের বিভ্রান্ত করেন। নিবারণবাবুকে একটু বলে দেওয়া দরকার। তাছাড়া আপনার ভাইপোর সম্বন্ধে বলার কিছুই নেই। ব্লু ব্লাড। নীল রক্ত মশাই—এর ধাতই হল একেবারে আলাদা। তবু বয়সটা খারাপ কি না—

নরেন দত্ত সর্বঘটে কাঁঠালী কলার মতো অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেও ওবেলায় শশধরবাবুদের পিকনিকের ভোজ খেয়ে আবার মাংসের গন্ধ পেয়ে এখানে এসে জুটেছে। তার হাতে বাসি ইংরেজি স্টেটস্‌ম্যানখানা ধরাই আছে। নরেন দত্ত বলে ওঠে—সিওর। আজকালকার ইয়ং জেনারেশন মশাই

একেবারে হেডস্ট্রং। ভালোমন্দ বিচারবোধই নেই।

হরিশমাস্টারও সায় দেয়—তাই তো দেখছি দত্তমশায়। বুদ্ধি নেই, সবই স্রেফ বদ বুদ্ধি।

বসন্তবাবু ভাবছেন কথাটা। আজ তার সব কামনাই পূর্ণ হয়েছে। ওই কর্তাদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। এখন বিপিনকে তার হাতে রাখতে হবে। বিরাট জাল ফেলেছেন—সেই জাল গুটিয়ে তুলতে হবে।

বিপিনও সুশান্তর ওই নিবারণবাবুর সঙ্গে মেলামেশার কথাটা শুনেছেন। হরিশমাস্টারের জিব দিয়ে গরল ছড়ায়, ওর ছেলেটার গতি একটা করতে হবে। শমীককে ধরে করে মেয়েটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নেবে এটা সে অনুমান করেছে। তাই এদের সঙ্গে মেলামেশা তার রাখতে হবে, তা ছাড়া বিপিনবাবুই এবার স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছেন।

হরিশ বলে—বুঝলেন, সুশীলবাবু অবশ্য অন্য কথা বলে।

—কি ! বিপুলবাবুও এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ওরা জেনেছে সামনের ইলেক্‌শনে তাদেরই দলকে জয়ী হতে হবে। নিজেদের স্বার্থ সেখানে বিজড়িত। এইসব লুটপাট নইলে বন্ধ হয়ে যাবে। সুশীলবাবুও এর মধ্যে কিছু জনমত গড়ে তুলতে পেরেছে তাদের বিরুদ্ধে। ওদের উন্নতিতে চোখ টাটাবার লোকের অভাব হয় নি। তাই সাবধান হতে চান তাঁরা।

হরিশ বলে—ওই সুশান্তকে নাকি ছোটবাবু জেনেশুনেই নিবাবণবাবুর ওখানে যেতে দেন, কারণ দুদলেরই প্রতিপত্তি রাখতে চেষ্টা করার দরকার। কখন কোন্ দল ওঠে নামে।

—কি বলছো হরিশ ? চমকে ওঠেন বসন্তনারায়ণ।

হরিশ হাসছে বিনীত ভাবে। জানায়—দুর্জনের ছলের অভাব হয় না স্যার। এসব কথা ওখানে ওঠে তাই কানে এল, জানালাম।

বসন্তবাবু গম্ভীর ভাবে ফুরসি টানছেন। বিপিন একটু সচকিত হয়ে ওঠে। সামনেই ওঁরা সুশান্তকে দেখবে ভাবেন নি।

বসন্তনারায়ণ ভারী গলায় ডাক দেন—শোন সুশান্ত ?

সুশান্ত দাঁড়াল। মনে হয় যেন মেঘ ডাকছে। ভয়ও হয়। কিন্তু তার মনের অতলে কোনো কঠিন একটা সত্ত্বা ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। যে ওদের সব স্বার্থপরতা আর অন্যায়কে জেনে ফেলেছে, দেখেছে ওদের সেই একান্ত লোভী মূর্তিটাকে।

—নিবারণবাবুর ওখানে প্রায়ই যাতায়াত করো শুনছি।

কাকামণি ওকে প্রশ্ন করেন। সুশান্ত ওদের দিকে চাইলো। অনেকগুলো ছায়া ছায়া মুখ তার দিকে চেয়ে আছে। বিপিনদাও রয়েছেন ওঁদের মধ্যে, তাঁর মুখে বিচিত্র একটা ছায়া।

—জবাব দাও! ধমকে ওঠেন বসন্তবাবু।

কে বলে—এখন ওসব থাক ছোটবাবু, ছেলেমানুষ গেছে, পরে বলে দেবেন। ও তো ভালো ছেলে—বুঝিয়ে বললে আপনার আদেশ ও মানবেই।

বসন্তবাবুর নীল রক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

সুশান্তর মনে হয় ওরা যেন কাছারিবাড়ির থামে বেঁধে রেখেছে কোনো অবাধ্য প্রজাকে, আর শাসাচ্ছে। তার নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই। স্বাধীনতাটুকুও থাকবে না। ওরা তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের স্বার্থের হাঁড়িকাঠে তাকে বলি দেবে।

—জবাব দেবে না? বসন্তবাবু হাঁক পাড়েন—সরকার! এটাকে আজ টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখো গে, কাল দেখা যাবে।

সুশান্ত বলে ওঠে—নিবারণবাবু কি দোষ করেছেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলাও অপরাধ ? স্বাধীনতার জন্য আজ আপনারা যা পেয়েছেন তার মূলে ওঁদের আত্মত্যাগ আপনাদের সকলের চেয়েও বেশী।

—সাট্ আপ্? বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন। দাঁত টিপে বলেন তিনি—বেশ তৈরি হয়েছো দেখছি। অনেক কথাই শুনেছি।

সুশান্ত অন্য কোনো মানুষ হয়ে উঠেছে আজ। তার কাছে এদের ফাঁকি-

গুলো সব ধরা পড়ে গেছে। সব মুখোশ খুলে পড়ে প্রকৃত স্বরূপ ফুটে ওঠে। ঘৃণায় কোনো জবাবই দেয় না আর।

বসন্তবাবু বলেন—সরকার, এটাকে ওপরের মহলে যেতে দাও, কাল দেখা যাবে। আর হ্যাঁ—কাছারিঘরের শঙ্করমাছের চাবুকটাও ওপরে পাঠিয়ে দিও। অনেকদিন ওটা ব্যবহার করি নি, আবার করতে হবে।

সুশান্ত ভেবেছিল বিপিনবাবু কিছু বলবেন, কিন্তু তিনিও বোধহয় চান সুশান্তর শাস্তি হওয়া দরকার। কারণ সে তাদের সব কিছুকে কি নরীবে সমর্থন করবে না?

শমীকও এর মধ্যে এসে জুটেছে। সুশান্তর দিকে চেয়ে আছে সে।

ওর এই অপমানে খুশী হয়েছে সে। বলে ওঠে—একটু বেড়েছিলি সুশান্ত। আজ তো শুনলাম অনেক জ্ঞান নিয়ে এসেছিস?

সুশান্ত ঘৃণাভরে ওর দিকে চাইলো। একটু আগে দেখেছে ওই জানোয়ারটা অন্ধকারে কি দুর্বার লালসা নিয়ে একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করেছে তার দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে।

সুশান্ত বলে—তোর মতো কারও অভাব আর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ করাকে সারা অন্তর দিয়ে আমি ঘৃণা করি।

শমীক চমকে ওঠে। একটু আগেই সে কি করেছে তা জানে। পরক্ষণেই সহজ হয়ে ওঠে সে। ওই লুণ্ঠন করার অধিকারটা তার যেন জন্মগত। তাই সহজ বলেই গ্রহণ করেছে সেটাকে। শমীক বলে—ওসব নীতিবাদের কচ-কচিই শিখেছিস ওখানে গিয়ে। এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবি।

সুশান্ত ভুলে গেছে তার চারিদিকের এই পরিবেশ। আজ জেনেছে ওরা তাকে স্বীকার করবে না। এদের কাছে তার ভয় করারও কিছু নেই। সব লজ্জা ভয় দ্বিধা তার ভেঙে গেছে। বলে সে—না! বরং তোকেই বলবো সাবধান হ শমীক!

সুশান্ত দাঁড়ালো না। বের হয়ে গেল। এই তেজস্বী কণ্ঠে জবাব যেন সে এদের সকলকেই দিয়ে গেল।

নরেন দত্ত বলে—হেডস্ট্রং বলে না, এ তাই ছোটবাবু।

বসন্তনারায়ণের মৌয়াতটা চটকে গেছে। ওসব ব্যাপার পরে দেখা যাবে। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আজকের এই আনন্দ উৎসবকে ম্লান করতে চান না তিনি। বলেন—সরকার! একটু দ্রব্যট্রব্য দাও হে। সব যে জুড়িয়ে গেল। আর কয়েকটা প্লেটে কিছু ফ্রাইও দিও। চলুক বিপুলবাবু, নিন। ওহে নরোত্তম ভায়া।

সদরের কর্তাব্যক্তি তিনি—আজকের সম্মানিত অতিথি। তাঁকেও সমাদর করেন ছোটবাবু। অবস্থাটা সহজ হয়ে আসে। হরিশমাস্টার মালটাল খায় না। সে তন্ময় হয়ে মেটে চচ্চড়ি চুষছে। বসন্তবাবু রসিকতা করেন—ওহে হরিশ, গলাটা একটু ভেজাও।

—আজ্ঞে ? কি যে বলেন ? হেঁ হেঁ হেঁ। এই তো মেটুলি খাচ্ছি।

বিপিন বের হয়ে এসেছে। সতেজ তাজা ওই সুশান্তর মুখে চোখে সে দেখেছে একটা কাঠিন্য। সেই বিনয়ী মার্জিত ছেলেটি সহসা কঠিনভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে। নিবারণবাবুর অবদান এতে কতটুকু তা জানেন না—তবে মনে হয় এ যেন আগামী দিনের যৌবন ?

যারা ধীরে ধীরে মাথা তুলছে, শক্তি সঞ্চয় করছে, এই কয়েক বৎসরের শাসন ভার হাতে এসে এঁরা অনেকেই নিজেদের ব্যাপারটাই গুছিয়ে নিয়েছেন। বিপিনবাবু স্থিরভাবে অনেকবারই সেই অতীতদিনের প্রতিশ্রুতির কথা ভেবেছেন। কতটুকু পূরণ করতে পেরেছেন সেই প্রতিশ্রুতির ? বড় বড় কণ্ট্রাক্ট পারমিট সবই এসেছে বশবদ লোকদের হাতে। সরকার যে টাকা খরচ করতে চেয়েছেন জনসাধারণের কল্যাণে নানা খাতে, সেই টাকার বৃহত্তর একটা অংশ কোনো রন্ধ্রপথে পাচার হয়ে গেছে কাজের অজুহাতে।

কিন্তু প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। চারিপাশে একটা চক্র এভাবে গড়ে উঠেছে আর তাদেরই হাতে এমন কিছু ক্ষমতা চলে গেছে ; এখানে প্রতি-

বাদ করা মানেই নিজেকে সরিয়ে আনা। এই রাজনৈতিক মৃত্যু এত দিন পরিশ্রমের পর কেউই চায় না।

বিপিনের মনে হয়েছে এক এক সময় সে সরে যাবে, কিন্তু পারে নি নানা কারণে। একদল তরুণ নতুন একটি শ্রেণী মাথা তুলছে। তারাও এক-দিন রুখে দাঁড়াবে।

বিপিনবাবু জানেন না এর শেষ কোথায়? নিজের দিকটাও মনে পড়ে। কি পেয়েছেন তিনি? নতুন একটা সাড়া তার মনে সুর তুলেছে। পাবার বাসনা তাঁরও আছে। তিনিও বাঁচতে চান মানুষের মতো সব পেয়ে।

কিন্তু সুশান্তর এই প্রতিবাদ তাঁর এতদিনের মসৃণ গতিবেগহীন স্তিমিত জীবনে একটা আলোড়ন তুলেছে। এই যৌবনকে তিনিও দেখেছিলেন অতীতে।

নিবারণবাবু তখন এখানে রাজবন্দী হয়ে আছেন। বিপ্লবী মানুষটি ছিল তার কাছেও একটি প্রতিবাদের পুঞ্জীভূত উত্তাপ!

সেদিন বিপিন বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেদিন সংসারের বাঁধন মানে নি। চেয়েছিল সেদিন দুরন্ত যৌবন সব বাধাকে ভেঙে তছনচ করে দিতে।

আজ যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে নিজের কথা ভেবে থমকে দাঁড়িয়েছে তার সঞ্চয়ী মন।

—কি ভাবছেন তন্ময় হয়ে।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে উঠলো বিপিন। এগিয়ে আসে মিলি। ভিতর বাড়িতেও সুশান্তর খবরটা পৌঁছে দিয়েছে শমীক। বলে সে—কাল শান্তদার হাল খারাপ হয়ে যাবে। আজই হোতো—তা লোকজন রয়েছে বলে মুলতুবী রইলো।

কাকীমা চমকে ওঠে—কেন রে?

শমীক শোনায়—তেজ দেখাতে গেছল! ওই সুশীল, বুড়ো নিবারণবাবুর দলের মন্তর পড়েছে কিনা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

মিলিও কথাগুলো শুনে নেমে আসছিল, পথে ওকে দেখে দাঁড়িয়েছে। বিপিন ওর দিকে চাইলো। খোলা ছাদের একদিকে দাঁড়িয়ে আছে বিপিন, তারার আবছা আলো ওর মুখে পড়েছে। মিলি ভাবে নি বিপিনকে এমনি রাত নির্জনে দেখবে। বলে ওঠে সে—একা একা কার ধ্যান করছেন?

বিপিন মন থেকে সব জড়তা মুছে ফেলতে চায়। হালকা হতে চায় সে। বলে—তোমারই!

—ইস্! মুনি ঋষির মতো লোক আপনি। দেশের মানুষ নাম করতে হেদিয়ে পড়ে। তাদের কথা ভাববেন না, ভাববেন আমার কথা?

হালকা সুরে মিলি ছিটিয়ে পড়ছে কি একটা বাঁধভাঙা ঢেউ-এর মতো। ওর কথার সুরে ওঠে সমুদ্রের কল-কল্লোল। সেই কলস্রোত হারিয়ে গেছে বিপিন।

বিপিন আজ এমনি একটি প্রশান্তির স্বপ্ন দেখে। সারা মন জুড়ে পেতে চায় সেই আশ্বাস। বলে সে—তাই ভাবছিলাম মিলি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওই ঝড়ের মধ্যে থেকে সরে এসে একটা বেশ ছোট বাসা বাঁধবো। সেখানে থাকবে বাঁচার আশ্বাস—পাওয়ার স্বপ্ন। এমনি উল্কার মতো জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে যেতে চাই না!

মিলি ওর কথাগুলো শুনছে। ওর ডাগর কালো দুই চোখে সেই স্বপ্নের নীল ছায়া। তারার আলো চিকমিক করে তার আয়ত চোখের চাহনিতে। এই স্বপ্ন সেও দেখেছে বার বার। ওর হাতখানা নিজের হাতে টেনে নেয় মিলি। উত্তপ্ত সেই ছোঁয়াটুকু মিলির সারা মনে কি চাঞ্চল্য আনে। সেই গভীর তৃপ্তির অতলে হারিয়ে যেতে চায় বিপিন। বলে সে—এই জ্বালা ব্যর্থতা দেখেছি নিবারণবাবুর জীবনে। একদিন অনেক শপথ অনেক আগুন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু আজ তিনি ব্যর্থ—শূন্য। পুড়ে যাওয়া উল্কার মতো শুধু জ্বালা নিয়েই সবকিছুকে আঘাত করতে চান। যেন দুর্বাসা, সব কিছুর উপরই তাঁর অভিশাপ। ওই জীবনকে ভয় করি মিলি। আমি সব পেয়ে বাঁচতে চাই।

সুশান্ত সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনের ছাদে ওই ছায়ামূর্তিকে দেখেছে। শুনেছে ওদের কথাগুলো। অবাক্ হয়েছে সে। অনুমান করেছিল বিপিনদার সম্বন্ধে অমনি একটা ব্যাপার।

সেই তেজস্বী মানুষটাকেও আজ ওই নিশ্চিন্ত জীবনের মায়া কেমন বন্দী করে ফেলেছে। সেও আজ আবর্ত থেকে সরে এসে বাঁচতে চায়। ঘর বাঁধবে, ব্যবসা করবে, চোরাবাজারে মুনাফা লুটবে, আর বছর বছর পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিয়ে ঘর ভরিয়ে তুলবে। পরম পাওয়া। এইটাই তাদের কাছে পরম পাওয়া। তারা তাই নিবারণবাবুর দর্শনকে ভয় করে। তার ওই পথ আর মতকে স্বার্থবিরোধী বলে ভাবে। সুশান্তও দেখেছে, বিপিনদা তাই এই অন্যায়টার প্রতিবাদ করেনি। কাকামণি তাকে শাসিয়েছে, তবু আরও কঠিন হয়ে উঠেছে সুশান্ত।

—কে!···চকিতের মধ্যে মিলির সন্ধানী দৃষ্টি যেন ওকে দেখতে পায়। ও সরে গেছে বিপিনের কাছ থেকে। ধরা পড়ে গেছে তার এই নিশীথ অভিসার পর্ব। ধূর্ত সাবধানী মেয়েটা সজাগ হয়ে ওঠে।

সুশান্ত এগিয়ে যায়—আমি!

মিলি ওকে দেখছে। ছ'চোখ জ্বলছে মিলির। সুশান্তর মনে হয় এগুলো যেন বাঘিনীর চোখ। মিলি কঠিন স্বরে শুধায়—কি করছিলি এখানে?

সুশান্তর মনে হয়, সে ওদের অনেক গোপন রহস্যই জেনেছে আর ততই মনে হয়েছে মানুষ হিসাবে ওরা অতি সাধারণ স্তরের জীব। নিজেদের পাওয়ার পরিধিতেই সীমিত। বলে ওঠে সুশান্ত—নাটক দেখছিলাম।

মিলি গর্জে ওঠে—এ্যাই বাঁদর কোথাকার!

সুশান্ত ওদের দেওয়া এই আখ্যাটাকে আজ মোটেই গায়ে মাখে না। বলে ওঠে—এ বাড়িতে অনেক নাটকই হচ্ছে। আমি শুধু ভগ্নদূত হয়ে রইলাম। তাহলে মিলিদি—তুইও—

মিলি কোণঠাসা বেড়ালের মতো ফুঁসে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে ওর গালেই সপাটে একটা চড় কষে গর্জায়—অভদ্র, ইতর কোথাকার।

হাসছে সুশান্ত। রাগল না। মিলিদি এই অবসরে সরে গেছে ভিতর মহ-লের দিকে। সুশান্ত দেখছে বিপিনদাকে। ওর মুখ চোখের পরিবর্তনটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

বিপিনের মনে হয় তার কোথায় একটা পরাজয় ঘটেছে। ওর সেই লোভী মনের সব ছবিটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে ওই ছেলেটির সামনে। সুশান্ত শুধায়—আপনি কিছু বলবেন নাকি ?

বিপিন নিজেকে অসহায় বোধ করে। সুশান্ত দেখেছে ওই মানুষটার অপ-মৃত্যু! মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়া পতঙ্গের মতো অসহায় অবস্থা হয়েছে বিপিনদার। সুশান্ত বলে—থাক। তবে একটা কথা বলবো বিপিনদা, নিবারণবাবুকে একদিন আপনিই গুরু বলে মেনে ছিলেন। রাজনীতি আমি করি নি, তবে মানুষ হিসাবে নিবারণবাবুকে শ্রদ্ধা করবো। তিনি অন্তত মিথ্যাচার করেন নি, লোভের কাছে বিক্রী করেন নি নিজেকে। আপনার সব কিছু থাক, যাক দুঃখ করবো না। তবে নিবারণবাবুকে শ্রদ্ধা করার মতো মনটুকুরও যেন অপমৃত্যু না ঘটে এইটাই বলবো।

সুশান্ত কথাগুলো শেষ করে দাঁড়ালো না জবাবের আশায়। চলে গেল ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরের দিকে।

·

কাকীমা যেন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল ওখানে। ওকে ফিরতে দেখে মাধুরী এগিয়ে আসে। দেওয়ালের চুন পলেস্তারা খসে গেছে। তাতে আলো পড়ে কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে। সেই শূন্যতার মাঝে কাকীমা ওকে দেখে বলে ওঠেন—আবার কি বাধালি আজ ? তোর জন্য কি মাথা খুঁড়ে মরবো ?

হাসছে সুশান্ত—কিছু না কাকীমা। বলবো না কিছুই, শুধু চোখ খুলে দেখে চলেছি মাত্র। ভয় পেয়ো না।

মাধুরী এই বিচিত্র ছেলেটাকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন। নিজের ছেলেকে চিনতে পারেন। কিন্তু এই সুশান্ত তার কাছে একটা রহস্য।

ভালো খুব ভালো ছেলে, তবু কোথায় ওর মনে একটা আগুন রয়ে গেছে। যা দিয়ে ও সব আঁধারকে আলো করে দিতে পারে। নয়তো কি নিষ্ফল ব্যর্থতায় নিজেকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও পারে। ভয় হয় মাধুরীর।

সুশান্ত হাসছে—ওসব নিয়ে ভেবো না কাকীমা। চল খেতে টেতে দেবে। মিলিদিটা কোথায়? বিলি শমীক ওরা খেয়েছে?

ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতে চায় সুশান্ত, তার সহজাত হাসির হালকা আভাসে। নিচেকার কাছারিবাড়িতে হেসাক জ্বলছে। ভাঙা ধ্বংসপুরীতে আলোর আভাস জাগে। ওদের কলরব হাসি কার টুকরো গানের শব্দ ভেসে আসে, বোধহয় পানীয়ের মাত্রা আজ ছাড়িয়ে যাবে খুশীর ধমকে। মাধুরী ওই যুগটাকে দেখেছে, ওই মানুষগুলোকে চেনে। কিন্তু আজকের কালের সুশান্তদের চেনে না। ওরা কেমন হেঁয়ালীর মতোই। কখনও স্পষ্ট কখনও আবছা। ভয় ভয় করে মাধুরীর। মাধুরী জানায়—বিপিনকে এখানে খেতে বলেছি। ওরা বোধহয় অপেক্ষা করছে, তুইও চল!

হাসলো সুশান্ত। জানে তাকে দেখলে ওদের আনন্দের আকাশে আজ কালো মেঘ নামবে। ওরাও তাকে জেনেছে যেন তাদের সে শত্রু। তাই এড়িয়ে চলতে চায় সুশান্ত। বলে—অবেলায় নেমন্তন্ন খেয়েছি কাকীমা শশধর কাকাদের পিকনিকে। খিদে নেই। ওদের খেতে দাও গে।

—তুই খাবি না? কাকীমা ওর দিকে চেয়ে থাকে।

সুশান্ত জানায়—সত্যি বলছি খিদে নেই, নইলে না খেয়ে থাকার লোক আমি? বলো?

কাকীমা চলে গেল। সুশান্ত আলোটা কমিয়ে জানলার বাইরে ওই তারা জ্বলা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। তার ভাবনাগুলো অমনি অন্ধকার অতলে হারিয়ে যায়। সবকিছু কেমন অস্বস্তিকর আর শূন্য বোধহয়। চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ একটা আলোর নিশানা জেগে ওঠে। কোথায় মেঘমুক্ত আকাশে

আলোর ইশারা জাগে। কাশফুল ফোটা প্রান্তরের অবাধ মুক্তির আহ্বান সেই আলোকোজ্জ্বল সীমানা পার হয়ে কোন্ এক বিচিত্র রাজ্যে সে উধাও হয়েছে। সেখানের নীল উজ্জ্বল দীপ্তির শীর্ষে একটি সান্ত্বনা আশ্বাস কি বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে অভাব নেই নীচতা নেই। স্বার্থ-পরতার কালো ছায়াও নেই।

···সেই পথের সন্ধানে চলেছে তারা। সে আর কেয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। রূপালী বালুচরে পা দেবে যায়, হাঁপাচ্ছে কেয়া। ওর নরম নিটোল হাতখানা তার মুঠোয় ধরা। কালো একরাশ চুল এসে পড়েছে ওর চোখে মুখে। শরীরের রেখাগুলো কেমন স্বচ্ছ, সব কামনা বাসনার বাঁধন পেরিয়ে ওরা অসীম মুক্তির পরিসরে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং। সুরেলা সেই শব্দটা দূর দিগন্তে কেঁপে কেঁপে হারিয়ে যায়।

—এ কোন্ জগতে চলেছি শান্ত?

কেয়ার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর যেন আলোকণা হয়ে ছিটিয়ে পড়েছে প্রদীপ্ত আভায়।

—আলোর জগতে। সত্যের সন্ধানে।

—কিন্তু তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না শান্ত!

সুশান্তর সামনে কেয়ার দেহটা উজ্জ্বল রেখায় পরিণত হয়েছে। শান্ত জানায়

—এই তো আমি। সব মিথ্যার কালোয় হারিয়ে গেছি আমি। তুমি তবু উজ্জ্বল বর্ণময়। তুমি আমায় পথ দেখাও। ওর হাতখানা ধরে এগিয়ে চলেছে সে, চোখের দৃষ্টি ভরে উঠেছে কি প্রদীপ্ত আলোয়!

ধড়মড় করে উঠে বসলো সুশান্ত। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। সারা রাত ঘুমিয়েছে অসাড়ে। খোলা জানলা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে। ঘর ভরে গেছে। বাগানে পাখীগুলো কলরব করে। মিষ্টি শিশির-মাখা সকালে ওই বিচিত্র স্বপ্নের রেশ তার মনে নীরব একটা সাড়া এনেছে। ক্রমশ হারানো ঘটনাগুলো ফিরে ফিরে আসে তার মনে। কাকামণিও

তাকে শাসিয়েছে। মিলিদি বিপিনদাকেও কি সব বলেছিল সে।
মিষ্টি সকালটা কেমন গ্লানিতে ভরে ওঠে।
ও বেশ নিঃসঙ্গ একা। তার চারপাশের সব বাঁধন সব সম্পর্কগুলো খসে খসে পড়ছে। আর মুক্ত বাধা পাখীর মতো সে যেন কোন্ শূন্যে উঠে চলেছে। তবু একটা সান্তনা তার রয়ে গেছে। কেয়ার কথা মনে পড়ে।

শশধরবাবু ব্যবসার সুবাদে সদরে যাতায়াত করেন। ক্রমশ তার ব্যবসা বেড়ে চলেছে। সৎ লোক, তাই বোধহয় সদরে মহাজন হরিনাথবাবুও তাঁকে মালপত্র বেশীই দেন। শশধরবাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের। সেই সুবাদে ছুজনে বন্ধু হয়ে উঠেছেন।
এই হরিনাথবাবুই সেবার এখানে ওদের বাড়িতে এসে কেয়াকে দেখে-ছিলেন। সুন্দরী মেয়েটির ব্যবহার বিনয় তাকে মুগ্ধ করেছিল। কথাটা তখন থেকেই ভেবেছিলেন। এতদিন বলা হয় নি। তার ছেলে জীবনের জন্য এমন একটি মেয়েরই সন্ধান করছিলেন তিনি।
সেদিন শশধরবাবুকে কথাটা পাড়তে শশধরবাবু অবাক্ হন। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। হরিনাথবাবুর সদরে বেশ ভালো অবস্থা। চালু কারবার। তাঁর ছেলের বৌ তিনি অনেক বড় ঘর থেকেই আনতে পারেন। শশধরবাবু বলেন—কি বলছেন হরিনাথবাবু?
হরিনাথবাবু হাসলেন। তিনি জানেন তাঁর ছেলে জীবনকে। এই বয়সের অনেক গুণই তার জুটেছে। তাকে বাঁধতে পারে ওই কেয়ার মতো মেয়ে। তাই তাঁরই বেশী গরজ এখানে। তবু মুখ ফুটে সেই কথাটা জানান না। নেহাত দরাজ দিল ভালোমানুষের মতোই বলেন তিনি—ঠিকই বলছি শশধরবাবু। দেনা-পাওনার কোনো কথাই নাই। মা-কে শাঁখা সিন্দুর আর হরিতকী দিয়ে সম্প্রদান করবেন। এ ছাড়া আর দাবিই আমার নেই।
শশধরবাবু কি ভাবছেন। হরিনাথবাবু বলেন—ঠিক আছে বাড়ি ফিরে কথা বলুন গিন্নীর সঙ্গে। ছু'একদিন পরই না হয় জানাবেন।

শশধরবাবু জানেন তাঁর স্ত্রীরও এতে অমত হবে না। একমাত্রমেয়েকেয়ার এমনি ঘরে বিয়ে দেবার সাধ্যও তাঁর নেই। শশধরবাবু জানান—না না। তাঁর অমত নেই। এ তো মেয়েরপরমভাগ্য হরিনাথবাবু। এ সম্বন্ধে অমত কিছু নেই। বলছিলাম, পড়াশুনার কথা।

হরিনাথবাবু দিনও ঠিক করে ফেলতে চান। তাই জানান—তাহলে শুভ কাজে আর দেরি করতে চাই নাশশধরবাবু, পড়াশুনার ব্যাপারেএখানেও অসুবিধা হবে না।

ভবতারিণীও জানেন হরিনাথবাবুকে। সেইখান থেকে সম্বন্ধ আসতে সেও অবাক্ হয়েছে।

—কেয়া!

কেয়া মায়ের আকুল বিকুল ডাকে বের হয়ে এলো বারান্দায়। মা বলে ঠাকুরঘরে পেন্নাম করে আয়রে। তোর বাপকে প্রণাম কর। কেয়া বুঝতে পারে না হঠাৎ এই প্রণামের ব্যাপারটা। তাই মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। প্রভাতও কথাটা শুনেছে। সদরে বিরাট কোনো কারবারি লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার। কেয়া এখান থেকে চলে যাবে এই কথাটা ভেবে দুঃখও হয়েছিল। কিন্তু তবু বিয়ের ব্যাপার শুনে খুশী হয়ে বলে—বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে তোর। মস্ত লোক, গাড়ি বাড়ি, তোর তো বরাত ফিরে গেল রে!

কেয়া চমকে ওঠে। ওর ফর্সা মুখখানা নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে যায় কি জমাট আতঙ্কে। তার এতদিনের সব স্বপ্ন এই সুন্দর অবাধ স্বাধীন জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিত হতে হবে, এ কথাটা ভেবে সে শিউরে উঠছে। কেয়াকে ওই বাবা মা এমনকি প্রভাতদা পর্যন্ত এখান থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। কেয়া অস্ফুট কণ্ঠেপ্রতিবাদকরে ওঠে—বিয়ে? বিয়েআমি করবো না! তোমরা জোর করে আমাকে এখানথেকে দূর করে দিতে চাও, না?

মা ওকে কাছে টেনে নেয়। কেয়ার সারা মনে কি দুঃসহ বেদনা বাঁধভাঙা

জলস্রোতের মতো ঠেলে ওঠে। মায়ের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে কেয়া। নতুন একটা জীবনের অনিশ্চয়তা আর ভয় তার মনের সব সুরকে বিবর্ণ করে দিয়েছে।

এমনি সময় ঢুকেছে ওদের বাড়িতে সুশান্ত। হঠাৎ কেয়াকে কাঁদতে দেখে চমকে ওঠে। সুন্দর ফর্সা গাল দুটো বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। ফুলে ফুলে ওঠে ওর দেহটা।

সুশান্তর সারা মনে নীরব বেদনার অনুরণন। শুধায় সে—কি হয়েছে কাকীমা? হ্যাঁরে প্রভাত?

প্রভাত হাসছে খিলখিলিয়ে। মা কিছু বলবার আগে প্রভাত বলে—ওর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল সদরে। বিরাট বড়লোক—গাড়ি বাড়ি, রমরম কারবার সবই আছে।

চমকে ওঠে সুশান্ত। তার পায়ের নিচে থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। তার জীবন থেকে এই শান্ত মিষ্টি আলো-ঝলমল পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাবে কেয়া। তার শূন্য জীবনে কেয়াই ছিল একটা অবলম্বন। সেটকুও হারিয়ে যাবে।

—কেয়া। সুশান্ত তবু ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। ওইটাই নাকি সাধারণ ভদ্রতা। তার নিজের কোনো সঞ্চয় নেই যা দিয়ে কেয়াকে আটকে রাখতে পারে। এতদিন একটা স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই কেটেছে তার। সেই চরম আঘাত যে এমনি ভাবে ঘনিয়ে আসবে তা ভাবে নি।

কেয়াও দেখছে সুশান্তকে। ওর অতল মনে ছিল ওই শান্তকে জড়িয়ে কিছু ভালোলাগার স্বপ্ন, যেটা এই সবুজ স্নিগ্ধতারই অঙ্গ হয়ে মিশেছিল। সুশান্তর চোখে মুখে বেদনার কালো ছায়াটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

তবু সুশান্ত বলে—এতে কাঁদার কি আছে?

কেযা আরও মুগ্ধ হয়েছে। ওর জন্য তাহলে সুশান্তর সব ভালোবাসাই কৃত্রিম। চটে ওঠে কেয়া। ও তাকেও ঠকিয়েছে সেই ভালোলাগার ভান করে।

প্রভাতবলে—ছাই। ওসব ন্যাকামি। বুঝলি না, দাম বাড়াচ্ছে। ডাঁট নিচ্ছে।
—এ্যাই ! কেয়ার সজলচোখে ফুটে উঠেছে বিদ্যুতের আভা। ঝলসে ওঠে ওর দু'চোখ। বলে সে—তোমার মতো ন্যাকামি করি না। বুঝলি।
কেয়া অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে—ওদের কথা বলতে মানা করে দাও মা।
কেয়া চলে গেল ঘরের ভিতর। বাইরে থেকে তখনও প্রভাতের হাসির শব্দটা ওর কানে বিঁধছে। সুশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে যেতে দেখে ভবতারিণী বলে—চললি যে !
সুশান্ত জানায়—একটা কাজ আছে, যেতে হবে কাকীমা। সুশান্ত সরে আসতে চায়। তার নিজের মনের এই যন্ত্রণাটাকে ওদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না। প্রভাতের কাছেও নয়।
প্রভাত মনে মনে খুব খুশী হয়েছে এটা জেনেছে সুশান্ত। ওর জীবন থেকে কেয়া চলে যাবে, প্রভাত এটা জেনেই বোধহয় এতো প্রফুল্ল হয়েছে। মনে হয় সুশান্তর এই চক্রান্তে প্রভাতও জড়িত। প্রভাত শোনায়—বুঝলি শান্ত, বাবা বললেন সামনের মাসেই বিয়ে। আমাদের রেজাল্ট বেরুনোর আগেই। বিয়েতে বেশ মজা করা যাবে কিন্তু।
সুশান্ত জবাব দিলো না। প্রভাত ইচ্ছে করেই বোধহয় তাকে এইসব কথা শোনাচ্ছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে।
সুশান্ত কোনোরকম ঘাড় নেড়ে আনন্দ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বের হয়ে এলো।
কোথায় যাবে জানে না। বেলা হয়ে গেছে।
তরিতরকারি বিক্রি করার জন্য চাষীরা চলেছে বাজারের দিকে। শমীকের মটরবাইকের গর্জন শোনা যায়। ও কোথায় চলে গেল। বোধহয় রাস্তার কাজ দেখতে বের হয়েছে। সুশান্তর বিশ্রী লাগে। নিঃসঙ্গ—একক সে। ওদের মতো একটা নেশায় ডুবতে পারে নি। তাই নিজের যন্ত্রণাগুলোই তাকে অস্থির করে তুলেছে।

—কোথায় চললে আনমনা হয়ে ?

কার ডাকে থমকে দাঁড়ালো সুশান্ত। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথ ধরে সুশান্ত চলেছে। পথটা নির্জন—সামনে বড় পুকুরের জলের ধারে গাছগাছালি-গুলো ঘন হয়ে রয়েছে। ওদিকে তাদের বাড়ির পিছনের বাগান। নারকেল-গাছগুলোর পাতায় বাতাস আছড়ে পড়ে।

মিনতি পুকুরে স্নান সেরে ফিরছে। ওকে দেখে বলে ওঠে, ডাকছি সাড়া নেই যে। ব্যাপার কি ?

মেয়েটার নিটোল পুরুষ্টু মাংসল দেহে ভিজে কাপড়টা চেপে বসেছে। বুকের উন্নত ডৌলটুকু স্পষ্টতর সবাক্। ভিজে গামছাটা জড়িয়ে তাকে কোনোমতে ঢেকে রেখেছে মাত্র। নিজের এই দেহ-সম্পদের জন্য বিন্দু-মাত্র সংকোচ তার নেই। হাসছে মিনতি খিলখিলিয়ে।

—বিয়ের কথা শুনেই বিবাগী হবে নাকি ? এ্যাঁ ?

—কার বিয়ে! সুশান্ত ওর হাসি উচ্ছল ভাব আর ওই কথাগুলো শুনে অবাক্ হয়। মেয়েটা এমনি গায়ে পড়া তা জানে।.

মিনতি ডাগর দু'চোখে মাতালকরা আবেশ এনে শোনায়—ন্যাকা! কিছু জানো না ? কেয়ার বিয়ের কথা শুনেই হেদিয়ে গেছো। তা কদ্দিন আর আগলে রাখবে ?

সুশান্ত চমকে ওঠে। মিনতির নিটোল দেহে ভিজে কাপড়টা যেন সাড়া তুলেছে। গোল গোল হাত দুটো অনাবৃত। সুশান্ত সরে আসতে চায়। নির্জন ছায়াঘেরা জগৎ—ওই মেয়েটার অর্ধঅনাবৃত দেহ—ওই চাহনি তার মনে একটা ভয় এনেছে।

মিনতি বলে—কেয়া ছাড়া কি আর কাউকে চোখে পড়ে না? না আর কেউ নেই ? এতো গলাগলি কিসের! যদ্দিন পারো লুটে নাও। চলে গেলে আবার অন্য ফুলের খোঁজ করো। ব্যাটাছেলে—এ্যাঁ ?···

হাসিতে ভেঙে পড়ে মেয়েটা। সুশান্ত দাঁড়ালো না। ভয়ে ও যেন পালাচ্ছে। পেছনে ওই ধারালো হাসিটা তাকে বিঁধছে তীরের মতো।

ওরা তাকেও ভেবেছে অমনি শমীকের মতোই। ওদের মনে কোনো শুচিতা থাকতে পারে না, মিনতিরা তাই বিশ্বাস করে নিয়েছে। ওদের কাছে ওই দেহজ বুভুক্ষাটাই সবচেয়ে সত্যি।

সুশান্ত ওই কথা ভেবে শিউরে উঠেছে। কৈশোর আর যৌবন দুটো পর্যা-য়ের মাঝামাঝি অবস্থার সব ভাবনাগুলোই কেমন বিচিত্র। অনেক নতুন কিছু চোখে পড়ে। একদিকে রঙীন মন চায় বিরাট একটা কিছু করতে। সামনে সে খোঁজে একটা অবলম্বন—আদর্শ। লতা যেমন কোনো অব-লম্বনকে জড়িয়েধরে বাঁচতে চায়, তেমনি তরুণ মন সেই আদর্শকে অবলম্বন করে তার সব ভাবনা কর্মপ্রবণতাকে গড়ে তুলতে চায়।

আর অন্য মন চায় অনেক কিছু পেতে। নিজের সব কামনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে তার নিজের জগৎ। শমীককে দেখেছে সুশান্ত। সে এখন থেকেই তাই দুর্বার। মিনতিও তেমনি নেশার জগতের সঙ্গিনী।

সুশান্ত কি যেন খুঁজে ফেরে। অমনি সব পাওয়ার নেশায় গা ভাসিয়ে দিয়ে উন্মাদ হতে পারে নি সে। তার চোখের সামনে একটা আলোকোজ্জ্বল ছবি ভেসে ওঠে—নতুন একটা জগৎ যেখানে এই অত্যাচার—লোভের কালো ছায়া নেই। ও যেন সেই পথের সন্ধান করে। আলোঝলমল নীল আকাশ জুড়ে সাদা মেঘের ভেলায় ছেয়ে ওঠা আকাশ কোলে মাটির বুকে কাশ ফুলের সমারোহ, বাতাসে ওঠে বিচিত্র সুর। সেই পথ পার হয়ে চলেছে সে। কেয়ার হাতখানা তার হাতে। দুজনে ছুটে চলেছে, পা বসে যাচ্ছে নরম রূপালী বালিতে, হাঁপাচ্ছে। ওর লাল হয়ে ওঠা নরম গালে কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ওরা দুজনে চলেছে সামনের দিকে কি এক নতুন জগতের সন্ধানে।

একটা আর্ত চিৎকার চমকে ওঠে সুশান্ত। নীল আকাশের বুকে সাদা একটা কবুতর উড়ছিল উধাও ডানা মেলে ওই নারকেল গাছের উপর দিয়ে। কোথা থেকে একটা বাজপাখী এসে ছোঁ মেরে পড়েছে ওর ওপর। ধারালো নখ আর ঠোঁট দিয়ে চরম আঘাত করেছে তাকে। আহত পাখীটা চিৎকার

করছে। পালাবার পথ নেই। সামনে ওর নিষ্ঠুর আদিম পাশবিকতা নিয়ে ওই বাজপাখীটা ওকে আঘাত করছে। ওর গলা দিয়ে বের হচ্ছে তীক্ষ্ণ হিংস্র একটা শব্দ। ওইকবুতরের কাতর আর্তনাদকে ছাপিয়ে ওঠে। আহত সাদা কবুতরটা রক্তাক্ত হয়ে ছিটকে পড়লো বাগানের একটা গাছের ডালে। বাজপাখীটা ওকে ধরে ফেলেছে।

নির্জন ছায়া ছায়া বাগানের পথটায় থমকে দাঁড়িয়েছে সুশান্ত।

কেয়ার কথা মনে পড়ে। সেও সাদা কবুতরের মতো এমনি শান্ত নীল আকাশে উড়ছিল তার মনের খুশীর পাখনা মেলে। হঠাৎ কোন্ এক হিংস্র বাজ-পাখী এসে ওকেও অমনি করে শিকারে পরিণত করেছে। ওর অসহায় আর্তনাদে ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস। কিন্তু সুশান্ত সেখানেও নীরব দর্শকের মতো দেখছে অসহায় মৃত্যুকে—অত্যাচার আর লালসাকে।

সুশান্ত কি ভাবছে। ওর মুখ চোখে ফুটে ওঠে কি কাঠিন্য। তার উপরও শুধু এমনি অন্যায় অত্যাচারই চলেছে। কাকামণি বার বার অপমান করেছে তাকে। জানিয়ে দিয়েছে তাদের মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা চলবে না। আঘাত দিয়েছে তাকে, নিষ্ঠুর আঘাত। তাই দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে।

একটা কঠিন সত্ত্বা জেগে ওঠে ছেলেটির মধ্যে। একটা বঞ্চনা থেকে সে মুক্তি পেতে চায়। ওদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে সে। পথে কাদের কোলাহল শ্লোগান শুনে ওদিকে চাইলো।

ব্লক অফিসে ডি.এম. সাহেব আসবেন। ওই জনতা চলেছে সেখানে তাদের দাবি জানাতে। বেআইনী বেনামী হাজার হাজার বিঘে জমি—ময়ূরাক্ষীর উর্বর চরভূমি এই অতীতের জমিদারের দল দখল করে রেখেছে। সেই সব জমি ওদের হাত থেকে বের করে তাদের দিতে হবে।

সুশান্তর মনে হয় লোভী মানুষগুলোর বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাবে। অনেক ধ্বসে পড়া জমিদারগোষ্ঠী সেই চক্রান্তে জড়িত। তার কাকা-

মণিও সেই যজ্ঞের অন্যতম হোতা। শুনেছে তেমনি একটা জমির উপর ওরা নাকি কি কল তৈরি করবে।

বিপিনদাই পরিকল্পনাটা পেশ করেছে সদরে। বিপুলবাবু, কাকামণি সদ-বের আরও দু'একজন আসা-যাওয়া করছে। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ আজ নিজেদের স্বার্থকে ঘিরে। সেই স্বার্থের জন্যই তার একদলকে শত্রু অন্য-দলকে মিত্রে পরিণত করেছে।

—হেঃ হেঃ হেঃ যাবেন নাকি শান্তবাবু ওই দলে?

অ্যাঃ—সুশান্ত চমকে উঠলো সামনে তাদের সরকার মশাইকে দেখে। শীর্ণ পাকানো দড়ির মতো চেহারা লোকটার। তাদের কাছারিবাড়ির একটা ঘরে বসে জাবদা খাতায় কি সব লেখে আর মাঝে মাঝে কোনো প্রজা-পাটকের মুখের উপর যা তা বলে।

সুশান্তকে এখানে দেখে সরকারমশাইও অবাক্ হয়েছে।

সুশান্ত জবাব দেয়—অন্যায় কিছু করেছে ওরা?

হাসছে সরকার—তা কেন করবে, তবে যা ওদের নয় সেইটাকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

সুশান্তর জবাবও তৈরি ছিল। বলে—আপনারাই তো বেআইনী ভাবে জোর করে এতদিন দখল করে রেখেছেন ওসব। আইন আজকে ওদের সেই অধিকার দিয়েছে। কতো জমি বেআইনী করে সরানো হয়েছে?

হাসছে সরকার মশাই—এ সব কথা না বাড়ানোই ভালো ছোটবাবু। কত্তারা শুনলে কি বলবেন। তবে একটা কথা বলি স্যার—নিবারণবাবু সুশীল-বাবুদের ওই চেঁচামেচিই সার। কলকাঠি নড়বে না।

সুশান্ত চুপ করে শুনছে ওর কথাগুলো। ও জানে ওদের ওই আবেদন নিবে-দনে সত্যিই কোনো ফল হবে না। ওরা তাদের শোষণের বাঁধন কায়েম করার সব ব্যবস্থাই পাকাপাকি করে রেখেছে।

কিন্তু এই কঠিন প্রাসাদ একদিন কি ভেঙে পড়বে না? সেদিন!···সুশান্ত জানে না সামনের পথ, তবে মনে হয় যতই মেঘ ঢেকে থাকুক, সে মেঘের

পারে আলোর রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠবেই।

ওর চোখের সামনে সূর্যোলোকিত সেই শিখর-চূড়ার ছবিটা ভেসে ওঠে। তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশীর্ষে আলোর তুফান জেগেছে। কোথায় ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং।

ওরা সেই সুউচ্চ পর্বতশিখরে কোন্ সূর্যালোকিত তীর্থের দিকে চলেছে। মিছিল চলেছে। অনেক তরুণ, ছেলেরা ও দলে রয়েছে। আগে আগে চলেছে নিবারণবাবু, সাদা চুল উড়ছে বাতাসে। বড় দেহটা এখন ঋজু। সুশান্ত দেখছে আরও কাউকে।

—প্রভাত! তুই!

প্রভাতও চলেছে সেই মিছিলে। রোদে ঘেমে উঠেছে তারা।

নতুন প্রদীপ্ত যৌবন আজ কি অচলায়তনকে ভাঙবার জন্য শপথ নিয়েছে।

ওরা চলেছে। প্রভাতের মুখটা উজ্জ্বল—ওকে ইশারায় ডাকে সে।

সুশান্তর মনে হয় সেও এগিয়ে যাবে। ওদের মিছিলে ওই জনস্রোতের সামিল হবে সব বিপদ ভয় বাধা তুচ্ছ করে। সেও চায় এদের এই স্বার্থের প্রাসাদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে।

সরকার ওকে দেখছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। সুশান্ত এর আগেও বার কয়েক কাকামণির শাসনের স্বরূপটাকে দেখেছে। জানে আজও সরকারমশাই গিয়ে খবরটা পৌঁছে দেবে। তবু পিছিয়ে পড়বে না সে। মনে হয় আলো রাঙানো কোন্ জগতের ডাক সে শুনেছে, যার পথ চলেছে সামনে দিয়ে।

—শান্তবাবু। আরে! ও শান্তবাবু।

ওকেও মিছিলে যেতে দেখে চমকে ওঠে সরকারমশাই। সুশান্তও জানে না সে পায়ে পায়ে এসে এদের দলের সামিল হয়েছে। কি এক উন্মাদনায় ভরে উঠেছে ওর মন। শান্ত সরকারের ডাকে জবাব দিলো না। চলেছে সে মিছিলে।

প্রভাতের পাশাপাশি চলেছে। প্রভাতও হাসলো ওকে দেখে। সুশান্তর সব লজ্জা, দুর্বলতা, ভয় যেন কেটে যাচ্ছে।

নিবারণবাবুও ওকে দেখেছেন। ওঁর দু'চোখে কি খুশীর আভাস।
সুশান্ত যেন এত দিনের একটা জীর্ণ খোলসকে ছেড়ে ফেলে নতুন একটি পরিচয়ে পরিচিত হতে চায়। এই তার প্রকৃত সত্য পরিচয়, এই তার নিজস্ব স্বরূপ। এ যুগের এ কালের বহু মানুষের সান্নিধ্যে তাদের আরও নতুন করে নিজেকে খুঁজে পায় সে।
দূরে কোথায় ঘণ্টা বাজছে, আলোর ঝলক জাগে। কাশবনে বাতাসের হু হু শব্দ জেগেছে। ওই পথ পার হয়ে চলেছে একটি তরুণ কোনো নতুন এক স্বপ্ন রাজ্যে। এক নিঃসঙ্গ কোনো পদাতিক যেন ব্যাকুল চিত্তে খুঁজে চলেছে তার কামনার স্বপ্নের সেই জগতটাকে।
সঙ্গী নেই নিঃসঙ্গ সে এই রৌদ্রভরা কলরবমুখর পৃথিবীব পথে।

ওরা ব্লক অফিসেব সামনে এসেছে। উপছে পড়ছে জনসমুদ্র। নিবারণবাবু, সুশীলবাবু ভাষণ দিচ্ছেন। ওদের দাবি জানাবার জন্য এসেছেন হাজারো মানুষ, ভূমিহীন কৃষক। সুশান্ত সেই সাড়াকে শুনেছে কল-কল্লোলের মতো। ওদের কলরব শোনা যায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে দেখে সুশান্ত, শমীক আরও কে রয়েছে তার সঙ্গে। ও বোধহয় এখানে কোনো কাজে এসেছিল। শমীক এখানে এই ভিড়ের মধ্যে সুশান্তকেও দেখে অবাক্ হয়। এগিয়ে এসে শুধায় শমীক—তুই! এদের সঙ্গে এখানে এসেছিস নাকি?
প্রভাত ওকে দেখছে। সুশান্ত যেন হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। সুশান্তর আজ ভয় নেই। প্রভাতের দিকে চাইলো, একটা ভরসা পায় সে। বলে ওঠে—কোনো? আসতে নেই?
শমীক সিগ্রেট থেকে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জানায়—কেন থাকবে না। গাল দেওয়া খুব সোজা। সহজেই হাততালি কুড়োনো যায়।
শমীক একটু থেমে বলে—পিছনে কেন? এগিয়ে গিয়ে বক্তৃতা দে!
শমীক সরে গেল কথাগুলো উপদেশের মতো বিতরণ করে।
প্রভাত বলে ওঠে—ননসেন্স। বাপের পয়সা উড়ছে আর এখন থেকেই

ধান্দায় ঘুরছে।

সুশান্ত আর প্রভাত ফিরছে গ্রামের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এতক্ষণে বুঝতে পারে সুশান্ত সারাদিন খাওয়া হয় নি, খিদে লেগেছে! পেটের ভিতর নাড়িগুলো যেন পাক দিচ্ছে। তবু ওর মনে একটা খুশীর আভাস জাগে। অন্ধকারে আকাশে তারাগুলো ঝকমকিয়ে উঠেছে। ওরা জ্বলছে সুশান্তর অন্ধকার মনে। আজ একটা পাওয়ার কথা অমনি প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রভাতকে সে আজ সব থেকে কাছে পেয়েছে। চিনেছে আপনজন বলে। আজ ওদের বন্ধুত্ব যেন কি আগুনের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রভাত বলে—জানতাম না যে তুই এসব কথা ভাবিস। শুনেছিলাম বটে তোর কাকামণি তোকে প্রায়ই শাসন করে, জুলুম করে। তুই নাকি ওর মুখের উপর জবাব দিয়ে থাকিস। বুঝলি, ওরা চায় সকলের কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে দিতে। কিন্তু তা কি পারা যায়? যায় না।

প্রভাতের কথাগুলো শুনছে সুশান্ত। আজ জানে বাড়িতেও খবর রটে গেছে এতক্ষণে? সরকারমশাই দুপুরে ফিরে গিয়েই খবরটা দিয়েছে। আর বাকী তথ্যটুকু এতক্ষণে শমীক গিয়ে পরিবেশন করেছে। আজ তাকে কাকামণির মুখোমুখি হতে হবে। হয়তো বিপিনদাও থাকবে তখন। সন্ধ্যায় ওদের ঠিকেদারী আর নতুন কোম্পানির কাজকর্মের হিসাব হয়—পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। সেই আসরে ওকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শাসাবে। সুশান্ত আজ কি একটা সাহস অর্জন করেছে।

প্রভাত বলে—চল, আমাদের ওখানেই। খেয়ে নিয়ে বাড়ি যাবি।

কি ভেবে সুশান্ত আজ অমত করে না। প্রভাতের সান্নিধ্যটুকু তার ভালো লাগে, সে আশ্বাস পায়। ওর মনে হয় একা সে নয়—তার সঙ্গে আছে প্রভাত, এতগুলো মানুষ, স্বয়ং নিবারণবাবুও। সুশীলবাবুও তাকে আজ দেখেছে ওদের সঙ্গে। দু'একটা কথা বলেছেন ওকে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। ক্রমশ সুশান্ত ওদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রভাতদের বাড়ি ঢুকতে ভবতারিণী এগিয়ে আসে। হ্যারিকেনের আলো

তুলে ওদের ধূলিধূসর ক্লান্ত উস্কোখুস্কো চেহারার দিকে চেয়ে থাকে। অবাক্ হয় ভবতারিণী সুশান্তকেও ওই অবস্থায় প্রভাতের সঙ্গে দেখে। মা হয়ে ছেলেকে ভবতারিণী চেনে। প্রভাত যে ওদের সঙ্গে মেশে, এখানে ওখানে যায়, এসব জানে। কিন্তু ওই বড় বাড়ির ছেলে হয়ে সুশান্তও এমনিভাবে পথে নামবে ভাবতে পারে নি।

—ওমা! শান্ত। তুইও গিয়েছিলি নাকি ওইসব মিছিলে? ওই মিটিং-এ।

প্রভাত জানায় সহজভাবে—কেন যাবে না?

সুশান্ত হাসলো। হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে কথাটা শোনা যায়—তবে আর কি 'গ্রেট' মহাপুরুষ এসেছেন জলধারা দিয়ে বরণ করো।

চমকে উঠে সুশান্ত। কেয়া এগিয়ে এসে ওর ওই ধূলিধূসর মূর্তির দিকে চেয়ে আছে। তীব্র কণ্ঠে জানায় কেয়া—নিজের পরকাল তো ঝরঝরে করছিস, আবার ওটাকেও টেনেছিস কেন? ওরা তো মোমের পুতুল, রোদ লাগালে গলে যাবে, গায়ের বর্ণ টুসকে যাবে—ওকে নিয়ে পথে এই দুপুর রোদ্দুরে গিইছিলি?

সুশান্ত ওকে দেখে চমকে ওঠে। কেয়ার ফর্সা রং আবছা আলোয় কেমন চকচকে হয়ে উঠেছে। কালো চোখ দুটোতে কি একটা জ্বালা। ভবতারিণী ধমকে ওঠে—থামবি তুই! যা—বাছারা এলো—

প্রভাত বলে—শান্তও আজ খেয়ে যাবে মা। সারাদিন খাওয়া হয় নি।

কেয়া বলে ওঠে—তবে আর কি! দেশোদ্ধার করে এলো। এক অন্ন দশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে দাও! আহা বেচারা!

—থামবি তুই! প্রভাত বোনকে ধমকে ওঠে।

সুশান্ত অবাক্ হয়ে ওই সুন্দর মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনের অতলে কি একটা জ্বালা ফুটে উঠেছে ওই কথায়।

সুশান্ত বলে—না না কাকীমা, বাড়িতে ভাববে। আম যাই।

—সেকি! প্রভাত চমকে ওঠে। ও জানে আজ সুশান্তর সম্বন্ধে ওদের বাড়িতে কিরকম অভ্যর্থনার আয়োজন থাকবে।

ভবতারিণীর মায়ের মনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে এই সুশান্তর জন্য। সে বলে—সে কি কথা, না খেয়ে যাবি ?
সুশান্ত কেয়ার স্থির সন্ধানী দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকে। ওর চাহনিতে কোথাও একটু স্নিগ্ধতা নেই। সুশান্ত জানায়—না। রাত হয় নি। বাড়িই চলে যাই কাকীমা। চলি প্রভাত !
সুশান্ত বের হয়ে গেল কি অভিমান আর জমাট রাগের মধ্য দিয়ে ! প্রভাত ফেটে পড়ে কেয়ার উদ্দেশ্যে।
—তোর সবটাতেই কথা বলা দরকার ! ওর সারাদিন খাওয়া জোটে নি। কাকামণিও জেনে গেছে ওর এই মিটিং-এ যাবার কথা ! বাড়ি গিয়ে কি জুটবে জানিস ওর বরাতে ?
কেয়া স্থির কণ্ঠে জানায়—সব দুঃখ-কষ্টকে জেনে শুনে তবে এগিয়ে যাবার সাহস থাকে, যাবে। নইলে ভণ্ডামির দরকার কি ? ও সেইটাই বুঝুক।
চমকে ওঠে ভবতারিণী—তাই বলে এমনি করে যে চলে গেল মুখপুড়ি ! তুই কেন গায়ে পড়ে ওসব বলতে গেলি ? ভবতারিণীর মনে পড়েছে এই কথাটা। সুশান্তর জন্য দুঃখ হয়। কেয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সরে গেল ঘরের ভিতরে। চমকে ওঠে সে।
সে তো এ সব কথা বলতে চায় নি। কিন্তু কি যেন দুর্বিষহ জ্বালায় আর সুশান্তর ওপর কি নিদারুণ অভিমানে এই কথাগুলো বলেছে সে।
অন্ধকারে চুপিসাড়ে খিড়কির পথ দিয়ে বাইরে এসেছে কেয়া। অন্ধকার চারিদিক ! ও খুঁজছে সুশান্তকে। গলিটা বোধহয় এখনও পার হয়ে যায় নি। চাপা স্বরে ডাকছে— শান্ত ! শান্ত !
কোনো সাড়া নেই। হুহু বইছে রাতের বাতাস। ওই ধ্বসে পড়া বিরাট বাড়িটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কি একটা অভিশাপের মতো। ওই অন্ধকার রহস্য আর বেদনার মাঝে সুশান্ত ফিরে যাচ্ছে। তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কেয়া !
হঠাৎ অনুভব করে কেয়া, ওর চোখে জল নেমেছে। হুহু জল। ও জানে

না সে কাঁদছে। বুকভরা একটা হতাশার বেদনা ওই কান্নায় ঝরে ঝরে পড়ছে।

সারাবাড়িটা থমথম করছে কি নিস্তব্ধতায়। কাছারিবাড়ির বারান্দায় আলোর আভাস লেগেছে, কাদের চাপা স্বরের কথাবার্তা শোনা যায়। ওখানে কিছু পরামর্শ হচ্ছে। সরকার মশাই হরিশমাস্টারের গলাও শোনা যায়। সে হেঁকে চলেছে—ওসব লম্বা লম্বা বাত অনেক শোনা আছে স্যার। বলে কি না—দখল নোবো। দিন না টিট্ করে।

হরিশমাস্টার নিবারণবাবুর স্কুলে কাজ করতো। সেখান থেকে ওর চাকরি ওই নিবারণবাবুই খতম করেছেন। কারণ হরিশমাস্টারের অনেক ধান্দা, মাস্টারিটা তার উপলক্ষ মাত্র। তাই হরিশমাস্টারের রাগ এতো নিবারণ-বাবুর ওপর।

বিপুলবাবুও রয়েছেন। তিনি বলেন—ওরা নাকি আমার মজুরদেরও কাজের রেট বাড়াতে বলেছে। যদি বাড়াবাড়ি করে সব দূর করে দিয়ে নতুন কুলি আনবো।

শমীকও তাই বলে—নিশ্চয়। দেখছিলাম ওদের ওই সব কাণ্ড।

সুশান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কাকামণি কি বলছেন ঠিক শোনা গেল না। পরিবেশটা কেমন থমথমে!

—কে? কে ওখানে? সরকারমশাই এই অন্ধকারেও ওর পায়ের শব্দ শুনে হেঁকে ওঠে।

এগিয়ে যায় সুশান্ত। ওকে দেখেই ওরা থেমে গেল। ওদের আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে সকলে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। সুশান্ত মনে মনে তৈরি হয়েছে। আজ সেও জবাব দেবে। তার নিজের মধ্যেই কঠিন একটা সত্ত্বা জেগে উঠেছে।

ওদিকে বসে আছেন জগরু গোঁসাই, এ বাড়ির পুরোহিত। পাঁজি-পুঁথি নিয়ে ওকে এই আসরে থাকতে দেখে একটু অবাক্ হয়েছে সুশান্ত। কারণ

নির্বিরোধী লোকটি এসব জায়গায় থাকে না। পূজা পাঠ কথকতা নিয়ে থাকে, পরিবেশটা একটু অন্যরকম।

কাকামণি যেন এখুনি রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু অবাক্ হয় সুশান্ত। কাকামণি আজ তার দিকে একবার চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কি নিদারুণ ঘৃণার কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তাতে।

শমীক ওর দিকে চেয়ে থাকে।

স্তব্ধ পরিবেশ—কি একটা বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে। সুশান্ত হঠাৎ চমকে ওঠে। ভারী পায়ের শব্দ উঠছে। সামনে চেয়েই চমকে ওঠে সুশান্ত।

—বাবা!

বাবাকে এসময় দেখবে তা ভাবে নি। বাবা সাধারণত বাড়ি কমই আসেন। তাঁর আসার আগে থেকেই বাড়িতে একটা আয়োজন শুরু হয়—কান্দীতে পালকী বেহারা পাঠানো হতো। বাস থেকে নেমে তিনি বাড়ি আসবেন। সুশান্তর মনেও একটা ভয় সেই সঙ্গে চাপা আনন্দও থাকতো। বাবার সম্বন্ধে অনেকের সহজ ধারণা থাকে। প্রভাতকে দেখেছে, বাবার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা অনেক সহজ আর স্বাভাবিক। কিন্তু তার সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটা ঠিক তার বিপরীত। দূর থেকে এড়িয়ে এসেছে এতদিন। তাই বাবার সম্বন্ধে তার মনে জমে আছে শুধু পুঞ্জীভূত ভয়।

এতদিন এসব ভাবতে পারে নি সুশান্ত। ক্রমশ মনে হয়েছে মা মারা যাবার পর বাবাও তাদের এড়িয়ে চলেছে। দূরে সরিয়ে দিয়েছে অবহেলায়।

সুশান্ত বাবাকে অভ্যাস বশেই প্রণাম করলো।

ওর দিকে চাইলেন নরেন্দ্রনারায়ণ। সেই দৃষ্টিতে কোনো স্নেহ নেই, উচ্ছ্বাস নেই—কেমন কঠিন সেই চাহনি।

বাবা ওর দিকে একবার চেয়ে ওপাশে ফরাশে গিয়ে বসে একটা তাকিয়া টেনে নিলেন। সুশান্ত যেন অবাধ্য কোনো প্রজা। জমিদারবাবুকে প্রণাম করার পরও জমিদারবাবুর রাগ এতটুকু পড়ে নি।

সুশান্ত সরে এলো। বিপুলবাবুর সঙ্গে বাবা কি সব কথা কইছেন। তার

এখানে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়, এটা বুঝেছে সুশান্ত। সরে এলো বাড়ির ভিতর দিকে।

একটা আয়োজন চলেছে সেখানে। রান্নামহলের দিক থেকে সাড়া ওঠে। বাড়তি লোকজন খাবে বোধহয়। বাতাসে ওঠে মাংস রান্নার খোসবু।

বিলি ওকে দেখে হাসলো। সব যেন একটা উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। বলে সে—এ্যাই শুনিস নি, মিলিদির বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, সামনের সপ্তাহেই বিয়ে। খুব ধুমধাম হবে। রসুনচৌকি বসবে। জ্যাঠামণিও এসে গেছেন ওরই জন্যে।

সুশান্ত থমকে দাঁড়িয়েছে। শমীক ফিরছিল ভিতরের দিকে, ফুৎ করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে বলে—বিয়ের কথা হতে বিপিনদা আজ লজ্জায় আসে নি। বুঝলি শান্ত। আরে ব্যাটাছেলে বিয়ে করবি তার এতো লজ্জা কেন? তা কিরে শান্ত, খুব তো শুনলাম দেশোদ্ধার করছিস? তাহলে জানতিস ভালো? কি, বোবা মেরে রইলে যে, জবাব দে?

সুশান্ত কথা বলে না। বিলিও বেহায়ার শেষ। শুধায় সে—কার সঙ্গে জমলো রে শান্তদা? কেয়ার সঙ্গে বুঝি?

সুশান্ত জবাব দিলো না। চলে যাচ্ছে। এদের জগৎ, এদের রুচি তার কেমন বিশ্রী ঠেকে। বিলি বলে—মিলিদিটাও বেশ জমেছিল কিন্তু। একেবারে ক্যাচ, কট্ কট্। দেখিস শান্তদা—কেয়াকে নিয়ে যেন ঢাকঢোল পেটাস নি? ওর তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে শুনছি, এসব কেন আবার!

শমীক অবাক্ হয়—তাই নাকি। কিরে সুশান্ত? লাভ যে শিকেয় উঠলো এইবার। তাই মনের খেদে ওই সর্বহারাদের দলে গিয়ে জুটেছিস? আরে, ছোঃ—মেয়ের আবার অভাব?

—শমীক! সুশান্ত ওকে যেন ধমকে ওঠে। ওর কাছ থেকে এসব কথা শুনতে সে চায় নি। বিলিও হাসছে বেহায়ার মতো! শমীক জবাব দিলো না। বিজ্ঞের মতো সিগারেট টানতে থাকে।

সুশান্ত উঠে গেল নিজের ঘরের দিকে। পথে মিলিদির সঙ্গে দেখা হয়।

মিলিদি ওকে দেখছে। সুশান্তর কাছে ওরা আজ সবাই যেন অনেক দূরের মানুষ। ওরা যেন জাল পেতেছিল, সেই জাল গুটোতে ব্যস্ত। ওদের হাসি, কথাবার্তা, প্রসাধন, সাজগোজ সব কিছুই ওই একটি উদ্দেশ্যকে ঘিরে। সুশান্তর আজ ওদের কিছুই বলার নেই। সরে গেল সে। মিলি দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মনে হয় সুশান্ত আজ তাকে সহ্য করতে পারে নি।

—শান্ত!

সুশান্ত দাঁড়ালো। মিলি এগিয়ে যায়। ও শুধালো—ওই বিয়েতে তুই খুশী হোসনি ?

সুশান্ত দেখছে মিলিদিকে। ও আজ সেজেছে।

ডাগর চোখ দুটোয় কালো কাজল রেখা। সেই চাহনিতে কি যেন বেদনা টলটলিয়ে ওঠে।

সুশান্তর মনে পড়ে বিপিনদার কথা। আজ দেখেছে তাকে, ওই শোভা-যাত্রার পুরোভাগে থাকতো এতদিন যে মানুষটা, সেই বিপিনদা আজ সাব-ধানে সঙ্গোপনে এড়িয়ে গেছে। নিজের কারবার, পারমিট ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। বাসরুটের হিসাব করছে আর বিয়ের আশীর্বাদের আয়োজন করছে আড়ালে।

আমূল বদলে গেছে যে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক এই পরিবর্তন। সুশান্ত বলে ওঠে—আমার অখুশীতে কার কি আসে যায় ? তবে একটা কথা বলবো মিলিদি ?

মিলি ওর দিকে চাইল সন্দিগ্ধ চাহনিতে। তবু শুধায় সে—কি বলবি ?

সুশান্ত বলে—লোকটার মনের লোভকে এতখানি জাগিয়ে দিয়েছিস তুই সেই লোভটা কি এইখানেই থামবে ?

চমকে ওঠে মিলি। সুশান্ত হাসছে। জানায় সে—যাক ও কথা! আমি এখানের কেউ নই। আমার মতামতের দাম কি বল ? আমরা সবাই ধূম-কেতু, যে যার নিজের জগতে জ্বালা নিয়েই ফিরছি। তুইও বুঝতে চাস নি অন্যকে, আমিও চাই নি।

মিলি সাফাই গাইবার চেষ্টা করে—বাবাও এসেছেন আশীর্বাদ করতে। বিয়েতে মত দিয়েছেন।

সুশান্ত কঠিন হয়ে ওঠে। জানায়—তার কাঁধ থেকে বোঝা নামবে, খুশী হয়েই মত দেবেন তিনি। কাকামণির ব্যবসা ভালো চলবে। তিনিও অমত করবেন না। বাবার এই মত দেওয়ার দাম কি বল ?

—কেন ? অবাক্ হয় মিলি।

অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলছে। স্তব্ধ রাতের অন্ধকারে হুহু বাতাস কি হাহাকার আনে। মায়ের কথা মনে পড়ে তার। বাঁধন তার হারিয়ে গেছে। আজ তারা সবাই কেমন স্বতন্ত্র ছত্রভঙ্গ কোনো পরাজিত সৈন্যদল। বলে সুশান্ত—ও তুই বুঝবি না মিলিদি। শুনে কাজ নেই।

সুশান্ত চলে গেল। ওর মনের অতলে সব কিছু কি প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আজ সে নিঃসঙ্গ একক। কোথাও তার কোনো সান্ত্বনা নেই। ইচ্ছে করে কঠিন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠতে—ওদের সকলের মুখোশগুলো খুলে ফেলে দিতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা প্রচণ্ড বাধা রয়ে গেছে।

সেই বাধাগুলো ভেঙে ফেলার সাধ্য তার নেই। কঠিন জমাট দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সে।

বাড়িতে উৎসবের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বিয়ের আর দেরি নেই। ভাঙা বাড়িটাকেই খানিকটা সারিয়ে রং করা হচ্ছে। সানাই বসবে, তাই ভাঙা দেউড়িকেও চুনকাম করা হয়েছে। সরকারমশাই দু'চারজন কর্মচারী চাকর-বাকর যারা এখনও টিকে আছে, তাদের সময় নেই।

সব আয়োজনের মধ্যেও সুশান্তর মনে হয় একটা মেঘ ঘনিয়ে আসছে, ঝড়ের কালো মেঘ! শমীক ব্যস্ত কিন্তু এত কিছুর মধ্যে সুশান্ত তার নিঃসঙ্গতাকে বেশী করে অনুভব করে। কাকামণিও ব্যস্ততার ভান করে এড়িয়ে চলেন। বাবা সেদিন ওকে ডেকেছিলেন দোতলার ঘরে। কাগজখানা সামনে

নামানো, একটা টেলিগ্রাম এসেছে। সুশান্তর মনে হয় ওই কঠিন দূরত্ব বজায় রাখা মানুষটি আজ তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চান।
বাবা ফুরসি টানছিলেন। টেলিগ্রামটা ওর হাতে তুলে দিয়ে চেয়ে থাকেন। সুশান্ত পাস করেছে ফার্স্ট ডিভিসনে। লেটারও পেয়েছে। নম্বর যা পেয়েছে তাতে মনে হয় জেলার মধ্যে সে স্ট্যাণ্ড করবে।
বাবার দিকে চাইল। হঠাৎ কি যেন খেয়ালবশেই বাবাকে প্রণাম করে সে। মনে হয় জমাট একটা পাথর হয়তো গলবে কিছুটা। কিন্তু বাবার মুখে কোনো ভাবান্তরই দেখল না সে। বাবা বলে ওঠেন—পড়াশোনা করতে চাও, না অন্য কিছু নিয়েই মেতে থাকবে? এটা ফার্স্ট একটা অভিযোগ। সুশান্ত যে অন্য কিছু করছে সেটা বাবার কানে ঠিক উঠেছে। আর তাতে যে বাবা খুশী হন নি এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওঁর কথায়।
সুশান্ত বাবার দিকে চাইল। বাবা মন্তব্য করেন—যদি পড়তে রাজী থাকো, ছ্যাখো, কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে···।
সুশান্ত জেনেছে ওরা তাঁর কাছে অনেক সত্য মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বলেছে আর সে সব কথা বিশ্বাস করেছেন তিনি। সুশান্ত বলে—যা শুনেছেন তার অনেকটুকুই সত্য নয়।
—কৈফিয়ত আমি চাই নি। আমি শুধু প্রতিশ্রুতি চেয়েছি যে তুমি ভালো ভাবে কলেজ লাইফ কাটিয়ে বের হবে। তারপর যা ভালো বোঝো করো, বলার কিছুই থাকবে না। নরেনবাবু ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। সুশান্তর মুখের কাঠিন্য তাঁর নজর এড়ায় নি। বলেন তিনি—কারোও ওপর ভরসা আশা এ যুগে করতে নেই, শান্ত। আই হ্যাভ অল্‌স ওয়াশড্ আপ মাই হ্যাণ্ডস! ট্রাই টু মেক ইওর ওন কেরিয়ার! ওইটুকু সাহায্য করবার দায়িত্ব মাত্র আমার। ছ্যাটস অল।
বাবা এর বেশী কিছু বলেন না। বের হয়ে এল সুশান্ত।
সারা বাড়িতে হইচই লেগেছে। কাছারিবাড়ির উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সরকারমশাই আর হরিশমাস্টার টুল টেনে ভিয়েনের পাশে বসে

হুঁকো হাতে ফরমাইস করে—একটু জালিকাটা রসগোল্লা করো শশী, আর রসকদম্ব হবে, তাতে যেন ক্ষীরের ভাগটা বেশী থাকে, অধিকারিবাড়ির কারিগরের থেকে সেরা জিনিস করতে হবে কিন্তু। হরিশমাস্টার এ বাড়ির সুনামের জন্য খুবই ভাবিত। সে বলে—হ্যাঁ বাবা, দেখো কৃতীর বদনাম না হয়।

সুশান্ত দাঁড়ালো না, বের হয়ে এল পথে।

হরিশমাস্টারও দেখছে ওকে। বলে—তালে এবার কলেজে লেগে যাও হে। মন দিয়ে পড়াশোনা করো। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।

হরিশমাস্টার বিদ্যা প্রসারের জন্যও উঠেপড়ে লেগেছে। গলা নামিয়ে বলে —ত্যজ দুর্জন সংসর্গং, ভজ সাধু সমাগমং! বুঝলে, বদসঙ্গ ছেড়ে দাও, সাধুসঙ্গ করো। জীবনে যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বাবাজী।

সুশান্ত ওর কথায় জবাব দিতে গিয়ে থামলো। ওদের চোখে সে যেন খরচার হিসাবে ধরা কোনো বস্তু। সুশান্ত চলে গেল। হরিশ মাস্টার হুঁকো টানা বন্ধ রেখে ওকে দেখছে। গজগজিয়ে ওঠে—দেখবে সরকার, এই ছেলের জন্য কর্তাবাবুকে বিপদে পড়তে হবে। মেজাজ দেখেছো?

সরকার মশাইয়ের মুখে তখন কয়েকটা লেডিক্যানি ঢুকে রয়েছে। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে সেই দ্রব্যগুলোকে কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করে। হরিশ দেখতে পেলেই বিপদ ঘটবে—অবশ্য সরকারও জানে—হরিশ-মাস্টার এখানে কেন এসে জমেছে। এই সব মাল কিছু সে হাতিয়ে নিয়ে যাবেই। তাতে সরকারের কিছু আসে যায় না।

হরিশমাস্টার বলে চলেছে—দৈত্য কুলের পেহ্লাদ হে। দেখো, আবার নরসিংহ অবতার না হন!

সরকার উবু উবু লেডিক্যানিগুলো গিলে সামলে নিয়ে সায় দেয়—তাই হবেন।

গ্রামের মধ্যে পরীক্ষার খবরও এসে গেছে। শান্ত ছায়াঘন পথ দিয়ে চলেছে

সুশান্ত। গোয়ালাপাড়ার ওদিকে নদীর ধারে নিবারণবাবুর খড়ো ঘরের সামনে বাগানে কারা যেন আলোচনায় ব্যস্ত। সুশীলবাবুও এসেছেন। নিবারণবাবু হঠাৎ সুশান্তকে দেখে এগিয়ে আসেন। খুশী হয়ে ওঠেন তিনি --এসো, এসো শান্ত। শুনলাম ভালো রেজাল্ট করেছ। সুশীল তো সদরেও জেনে এসেছে বোধহয় ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাবে। তার চেয়েও ভালো হয় যদি ন্যাশন্যাল স্কলারশিপ পাও। সেইটাই কাজের হবে।

সুশান্ত ওঁর দিকে চাইল। কি ভেবে প্রণাম করে ওঁকে সুশীলবাবুকে। সুশীলবাবুরও সদরে, কলকাতায় একটা মহলে ঘনিষ্ঠতা আছে। নিবারণবাবু সেই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতই দিয়েছেন ওকে।

সুশান্তর মনে পড়ে বাবার সেই কথাগুলো। ওদের সাহায্য নিয়ে পড়তে হবে তাকে আর তার বিনিময়ে তার স্বাধীন চিন্তাধারা আদর্শ সবকিছুকে বিসর্জন দিতে হবে। কাকামণির কথাটাই বাবা আজ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

সুশান্ত জানায়—বাড়ির সাহায্য নিয়ে পড়া মানেই নিজেকে ওদের কাছে নিঃশেষে বিকিয়ে দেওয়া। বাবাও তেমনি আভাসই দিয়েছেন।

—তাই নাকি! হেসে ওঠেন নিবারণবাবু। তিনি সুশান্তর কঠিন বেদনাতুর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। ছেলেটার মনের এই কাঠিন্য আর প্রতিরোধের আগুনের উত্তাপ তাঁকেও স্পর্শ করেছে। চির তরুণ একটি বিপ্লবী, বিদ্রোহের এই জ্বালাকে তিনি জানেন। চারিদিকে দেখেছেন, বিরাট একটা শ্রেণী কিছু পাবার উন্মাদনায় মেতে উঠেছে। তার মাঝে অন্যায়কে প্রতিবাদ করার আগুন কোথায় হারিয়ে গেছে।

কিন্তু সুশান্ত তাদের গোত্র ছাড়া।

সুশীলবাবু বলে সুশান্তকে—নিজের যোগ্যতার মূল্য পাবেই শান্ত।

সুশান্ত যেন স্বপ্ন দেখছে। নিবারণবাবু বের হয়ে গেছেন বিল অঞ্চলে কোন্ গ্রামে জরুরী কাজে। সুশান্ত স্কুল থেকে বাড়ির দিকে ফিরছে। স্কুলে আজ তার দাম বেড়ে গেছে। গ্রামের পথে অনেকেই তার সঙ্গে যেচে কথা

বলেছে।

বুড়ো গদাধরবাবু রিটায়ার করেছেন, চুপচাপ থাকেন। তিনিও বলেন—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও শান্ত। গ্রামের মুখ উজ্জল করো।

আজ সুশান্তর মনে একটা নতুন সুর বাজে। হয়তো নিজের যোগ্যতার জোরেই সে পড়াশোনা করবে। ওই ধ্বসে পড়া বাড়ির মানুষগুলোর কোনো সাহায্যই সে নেবে না। ওদের মতকেও সে অগ্রাহ্য করবে। নিজেকে বিক্রি করবে না ওদের লোভ আর হীন স্বার্থের কাছে।

—দেখতেও পাও না যে?

সুরেলা হাসি জড়ানো কথাগুলো ছায়া ছায়া রোদ্দুরকে সোনালী উজ্জ্বলতায় ভরে তোলে। কেয়া ডাকছে তাকে।

সুশান্ত থমকে দাঁড়ালো। একটি ঝকমকে পাখীডাকা মুহূর্ত। বাতাসে তখনও শেষ কনকচাঁপার মিষ্টি সুবাস ওঠে। সুশান্ত ওর দিকে চাইল। সেই সন্ধ্যায় কেয়া তাকে ও বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিল প্রকারান্তরে। সুশান্ত সেদিন বের হয়ে গিয়েছিল। ওর মনের অতলের সেই জ্বালা আর কাঠিন্যটা আজকের জয়ের আনন্দে অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে। প্রভাতের খবরও নিতে হবে। তা ছাড়া কাকীমাকে ও প্রণাম করতেই আসছিল। তাঁর কথাও আজ বার বার মনে পড়েছে—তাই আসা।

পথে কেয়াকে দেখে দাঁড়ালো সুশান্ত। ওর মুখে কি একটু হালকা হাসির ছোঁয়া। সেদিন যে মেয়েটি তাকে কঠিনভাবে অপমান করেছিল এ যেন সেই মেয়েই নয়, অন্য কোনো জন। নিটোল পুরুষ্ট হাতগুলো ওর দেহের পূর্ণতাকে ছন্দময় করে তুলেছে। চোখে হালকা হাসির আবেশ তুলে ও জানায়—খুব যে রাগ তোমার! কদিন একেবারে বেপাত্তা! আজ তো শুনলাম স্কলারশিপ পাচ্ছ? দাম বেড়ে গেছে! এখন কি চিনতে পারবে?

সুশান্ত দেখছে ওর মুখে চোখে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই! তাকে সেদিন ওই ভাবে কথা বলার অধিকারও তার রয়ে গেছে।

কেয়া বলে—মা তো কতো বকলো আমাকে, দাদারও খুব রাগ। একবার

মায়ের কাছে চল।

হাসছে সুশান্ত—এতো ভয় ?

কেয়া এগিয়ে আসে। ওর দিকে চাইল। ওর চোখে শুধু ভয় নয় একটা ভাবনার ছায়াও ঘনিয়ে এসেছে। বলে—আবার দাদার দলে ভিড়ে ওই সব মিটিং ফিটিং-এ যাচ্ছো শুনলাম!

কেয়ার কথা শুনে অবাক হয় সুশান্ত—কেন ?

—ওসব ভালো নয়। পড়াশোনা শেষ করো। কতো আশা তোমার ওপর। এখন থেকেই ওই সব নিয়ে মাতলে চলে ? দাদাকে বাবা কতো বকে, মা তো হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কেয়ার মুখে ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে আসে। সুশান্ত অবাক হয় ওর জন্য এই ভাবনা দেখে। মনের নিভৃতের সেই কঠিন পাথরটা হৃদয়ের উত্তাপে গলে গলে উষ্ণতর হয়ে উঠছে।

ভবতারিণীও ওদের কথার শব্দ শুনে বের হয়ে আসে—ওমা! শান্ত যে রে! কতো দিন আসিস নি।

কেয়া শোনায়—আসবে কি করে ? সম্মান নেই ওঁর ? একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি!

প্রণাম করল শান্ত। ভবতারিণী হাসছে। ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে—বড় হও বাবা। মুখ উজ্জ্বল করো।

—প্রভাত আছে ?

মা শোনায়—ওর কথা আর ব'লো না। এখন নাকি খুব ব্যস্ত। কোথায় যায় কি করে ওই জানে। ওকে এখান থেকে দূর করতে পারলে নিশ্চিন্ত হই।

সুশান্ত দেখছে কাকীমার মুখে কি বিরক্তির আভাস। ভবতারিণী সহজ হবার চেষ্টা করে—আয় বাবা, ভিতরে আয়। তোর কাকাবাবুও খুব খুশী হয়েছেন তোর পরীক্ষার খবর শুনে।

ভবতারিণী ছাড়লেন না, কেয়া আসন করে জলখাবার নিয়ে এসেছে।

—খা।

—এতো সব !

কেয়া মুখ টিপে হাসছিল। বলে ওঠে—সে রাত্রে না খেয়ে গিয়েছিলে, আজও না খেলে ভাববো রাগ পড়ে নি।

সামান্য এই স্পর্শটুকু সুশান্তর শূন্য মনে কি সাড়া আনে। পারিবারিক জীবনের এই ছোঁয়াটুকু থেকে সে বঞ্চিত। তাদের বাড়িতে ওর জন্য এমন কেউ নেই যে ওর কথা ভাববে। ওরা নিজের জগৎ নিয়েই ব্যস্ত।

ভবতারিণী বলে চলেছে—প্রভাতের ভর্তির ব্যাপার আছে, এদিকে বিয়েরও খরচ। সামনের মাসেই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তোমাদের বিয়েতেও নেমন্তন্ন করে গেল—যাক, তবু শুভকাজ চুকে গেলে বাঁচি।

কেয়া দাঁড়িয়ে ছিল। বিয়ের কথায় যেন খুশী হয়নি সে। বলে—মেয়েতো তোমাদের বোঝা। কোনোরকমে পার করতেপারলে বাঁচো। হাড় জুড়োয় তোমাদের। এদিকে ছেলেরা কি শান্তি দিচ্ছে তোমাদের বলতে পার ? হাড় মাস জ্বালিয়ে দিলে।

—কি রে, খুব লাগানো হচ্ছে বুঝি মৌকা পেয়ে ! এ্যাঁ !

প্রভাত বাড়ি ঢুকছে কেয়ার কথার জের টেনে। বাড়িতে পা দিয়ে তখন সুশান্তকে দেখে বলে—তুই ! তোর খোঁজে ওখানে গিয়েছিলাম, শুনলাম কোথায় বের হয়েছিস। সুশীলবাবুর ওখানে যেতে হয়েছিল—বললেন তোর কথা।

ভবতারিণী বলে ওঠে—সুশীলবাবুর বেদবাক্যি এবার থামা দিকি ! নিজের কথা ভাব। শহরে যেতে হবে, ভর্তির ফর্ম দরকার। আরও কি কাজকম্মো আছে উনি বলছিলেন।

প্রভাত জবাব দেয়—আবার কাজকম্মো ! ওগুলো কেন ? বুঝলি শান্ত, কেয়াটাই দারুণ এনিমি আমার। এবার ক্লিয়ার হচ্ছে—বাব্বাঃ। বাঁচা যাবে নিশ্চিন্তে, তাও কি উপায় আছে ? ভেবেছিলাম এবার কিছু দেশের কাজ করা যাবে—তা বাবা তো দূর করতে পারলে বাঁচেন—মা তো ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা ! ক্লিয়ার দি স্টেবল। বুঝলি, এবার জুত করে হোস্টেলে

বসে জমানো যাবে। চল—

সুশান্ত হাসছে। বলে চলেছে প্রভাত—শুনলাম, তোর বাবাও নাকি নোটিশ দিয়েছে! ত্যজ দুর্জন সংসর্গং। সব পেটি বুর্জোয়া মেণ্ট্যালিটি। বুঝলি—

কেয়া হাসছে। সুশান্ত বলে—হাসবি বৈকি! এতদিনের ঘাঁটি ছেড়ে বের হতে হবে—

কেয়া ফোড়ন দেয়—বল, ঘুঘুর বাসা ভেঙে গেল।

—খুব খুশী হয়েছিস দেখছি। প্রভাত গর্জে ওঠে। আরও কি বলতে যাচ্ছিল, বাইরে বাবার ভারী গলার শব্দ পেয়ে থামল। শশধরবাবু বাড়ি ঢুকছেন, হাতে ওঁর গহনার বাক্স। সুশান্তকে দেখে তিনিও খুশী হন।—এই যে, যাক, শুনে খুশী হলাম। দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। ছাখ প্রভাত, জীবনে বড় হতে গেলে সাধনার দরকার।

প্রভাতের এ সব কথা শোনা অভ্যেস আছে। তাই গা করল না।

কেয়া হাসছে দাদার এই হেনস্থা দেখে। প্রভাত এই ফাঁকে কেয়াকে একটা থাপ্পড়ের ভঙ্গী দেখিয়ে শাসায়।

শশধরবাবু বলেন—কই গো, গহনাগুলো একবার দেখে পছন্দ করে দাও, নিতুর দোকানে ফেরত দিতে হবে। ওরা আবার পালিশ টালিশ করে দেবে। এদিকে শুভ কাজেরও দেরি নেই।

ভবতারিণী বালা-চুড়িগুলো নিয়ে কেয়াকে বলে—মাপটা ঠিক আছে কিনা দেখে দে।

চমকে ওঠে কেয়া। ও যেন সোনার বেড়ি দিয়ে তাকে বাঁধতে চায় তারা। এই সুন্দর জগৎ থেকে, এদের কাছ থেকে জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে কোনো একটা মানুষ।

সুশান্তও অবাক হয়েছে, কেয়ার মুখ চোখে ফুটে উঠছে কি কাঠিন্য!

মা ধমকে ওঠে—দে ওগুলো দেখে।

কেয়া জানায়—দেখতে হবে না, ওই করো গে।

চলে গেল সে। ভবতারিণী মেয়েকে দেখছে।

শশধরবাবুই সামাল দেয়—ঠিক আছে। তাহলে পালিশ করতে দিইগে।

চলে গেলেন তিনি। দোকান খুলে এসেছেন। ভিড়ও হয় এই সময়।

প্রভাতও দেখেছে বোনেরএই ব্যাপারটা। বলে সে—ডাঁট! বুঝলি, পয়সা-ওয়ালার ঘরে যাচ্ছে কি না, তাই এতো ডাঁট।

কেয়ার দু'চোখ কি বেদনায় অভিমানে টলমল করে ওঠে। মুক্ত কণ্ঠে জানাতে চায়—এসব সে চায় নি। দাদার কথায় সে কঠিন কণ্ঠে বলে—থামবি তুই! যতোসব শেখানো বুলি কপচাতে শিখেছিস।

সুশান্তও সায় দেয় হাসতে হাসতে—ওসব শিখতে হবে তো তাই রপ্ত করে নিচ্ছে।

কেয়া যন্ত্রণাকাতর মুখ তুলে ওর দিকে চাইল। ওই চাহনির গভীরতা খুব অর্থবহ, সুশান্ত এভাবে কথাটা বলতে চায় নি।

কেয়া বলে—তোমরা ধরে বেঁধে একটা প্রাণীকে চাবকাতে খুব আনন্দ পাও, না!

সুশান্ত কি জবাবদেবে জানে না। প্রভাত ততক্ষণে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেছে দরজা দিয়ে। সুশান্ত চমকে ওঠে—এভাবে কথাটা বলতে চায় নি কেয়া। বিয়ে হচ্ছে ভালো ঘরে। এ তো সুখের কথা।

—থাক, আমার কথাটা না ভাবলেও পারো। আমি কে?…দয়া করে এটুকু দয়া তুমি করো না শান্তদা।

কি অসহায় কান্নায় ওর দু'চোখ বেয়ে জল নামে।

সুশান্ত চুপ করে বের হয়ে এল।

সে এই জীবন নাট্যের অসহায় দর্শক মাত্র। তার সবই হারিয়ে যাবে। নিজের পাবার কোনো অধিকার তার নেই। কেয়ার চোখের জলে সে দেখেছে এই নতুন দাবিকে হারিয়ে যেতে।

সুশান্ত এগিয়ে চলেছে শূন্যমনে! হঠাৎ নির্জন রাস্তায় মটরবাইকের হর্নের তীব্র শব্দ শুনে চমকে ওঠে। তার ভাবনারজাল ছিঁড়ে যায়। ধুলো উড়িয়ে

এই রোদে মটরবাইক নিয়ে চলেছে শমীক। পিছনে বসে আছে হরিশ-মাস্টারের মেয়ে মিনতি। ব্লাউজটার উপর শাড়ির আবরণ না থাকায়, হাওয়ায় উড়ছে শাড়িটা। মাংসল হাতত্নটো দিয়ে কদর্য ভঙ্গিতে শমীকের কোমর জড়িয়ে ধরে বসে আছে। হাসছে ও খিলখিলিয়ে, বোধহয় তাকে দেখে। ওরা বের হয়ে গেল। শমীকের খেয়াল নেই।

সুশান্ত ওদের ধাবমান মূর্তি হুটোর দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় শমীক তাঁকে যেন জানিয়ে গেল—সেই প্রকৃতপুরুষ, তার সব কিছু পাবার যোগ্যতা আছে। আর সে—জীবনযুদ্ধে হেরে যাবে। হারিয়ে যাবে তার সব কিছুই। কেয়ার চোখের জলে অসহায় কান্নাজড়ানো হাহাকারে কেয়াও তাকে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছে। নিজের ওপর নিজের কেমন ঘৃণা আসে।

বাড়িতে সানাই বসেছে। ধ্বসে পড়া বাড়িটা নতুন সাজে সেজেছে। নৃপেন্দ্র-নারায়ণ, বসন্তনারায়ণদের জমিদারি গতপ্রায়। কিন্তু নতুন সমাজে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। নতুন ব্যবসা, ওই বাসরুট সব মিলিয়ে যা আসছে জমিদারির মতো অঢেল না হলেও কম নয়। আরও পাবার স্বপ্ন তারা দেখে।

তাই মিলির বিয়েতে কোনো উদ্যোগ আয়োজনের ত্রুটি তাদের হয় নি। সদর থেকে পুলিশ ব্যাণ্ড এনেছে তদ্বির তদারক করে। হোমরা-চোমরা তাবত ব্যক্তিদের উপস্থিতিও হয়েছে। ক'দিনের জন্য জেনারেটার ভাড়া করে এনে সারা বাড়ি ওই কাছারিবাড়ির উঠানে, ঘরে বাতি জ্বালা হয়েছে। বিজলী বাতিতে ঝলমল করছে বাড়িটা। রং চং-এ ভরে উঠেছে। মাইকে দিন রাত চলেছে হিন্দী গান—নীরব পল্লী অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে উঠেছে।

সুশান্ত এই আনন্দ উৎসবকে ঠিক মেনে নিতে পারে নি। এই সমারোহের মধ্যেও সে যেন নিঃসঙ্গ—একা। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন, অনেক কুটুম্বও এসেছে; ভবতারিণীও এসে কদিন এ বাড়ির হাল ধরেছে। একা তার কাকীমা সামলাতে পারে না। তাই মাধুরীই নিজে গিয়ে ডেকে এনেছে

কেয়ার মাকে।

কলরব হইচই আর অকারণ হাসির শব্দে সারা বাড়ি মুখর। এখানে সুশান্ত নিজেকে আরও নিঃসঙ্গ বোধ করেছে বার বার। ব্যস্তসমস্ত হয়ে শমীক চরকির মতো ঘুরছে। বাইরের বাড়িতে পদস্থ অনেক অতিথির জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও রয়েছে। কাকামণি তাঁদের নিয়ে ব্যস্ত, কারণ তাঁর কাজ কারবারের তারাই প্রধান সহায়।

সুশান্তকে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে। ধমকও খাচ্ছে সে—একেবারে অপদার্থ তুমি। রান্নাঘরে কাটলেটগুলো হল কিনা দ্যাখো। হলে পাঠাতে বল। আর স্যালাডও যেন দেয় ওই সঙ্গে।

ওদিকে পুরোহিত হাঁক পাড়েন—পঞ্চগব্য কোথায়? উশ্বানথালা—

ওরা হইচই করছে।

মিলিদিকে আজ চেনা যায় না। সেজেছে, আর এই সাজটুকুর জন্যই যেন জীবনের এতগুলো দিন গুনেছিল সে। সুশান্ত দেখছে ওকে? কোনো একটি মেয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

—ওমা, সুশান্তদা কি বোকা দেখেছিস? ক্যাবলার মতো রয়েছে। মিনতিও এসে জুটেছে। তার সাজগোজের বাহারটা উদগ্র, ব্লাউজ পরেছে এইটুকু। মাংসল দেহটাকে প্রকট করে তোলার জন্য বহু চেষ্টাই করেছে সে। মাথার খোঁপাটা তুলে চুড়ো করে বাঁধা, তাতে মালা জড়ানো। চোখে বিশ্রীভাবে কাজল পরেছে, ঠোঁটের রংটাও কৃত্রিম। মিনতি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। হাসির ছন্দে উত্তাল দেহটাকে কাঁপাবার চেষ্টাও চোখে পড়ে। মিনতি বলে—ও ক্যাবলা! এ্যাঁ—চোখ দ্যাখ না, যেন গিলে খাচ্ছে।

সুশান্ত চমকে উঠে সরে এল। পিছনে ওদের হাসির লহর ওঠে।

কলরব বেড়ে চলেছে। নিচে দেখা যায় শোভাযাত্রা করে বাদ্যিবাজনা বাজিয়ে বর আসছে গাড়িতে! কয়েকখানা গাড়িই আসছে। হুড়মুড়িয়ে নিচে নামছে ওই মেয়ের দল।

—শাঁখ বাজা!

হুকুম আর হইচই এর শব্দ ওঠে। সুশান্ত অবাক্ হয়। বিপিনবাবু এবাড়িতে কতদিন কতবার এসেছে তার ইয়ত্তা নেই, আজকের এই আসাটা তাই কেমন বেমানান—বিশ্রী ঠেকে তার কাছে। বিপিনদা নিজেকে আজ নিঃশেষে হত্যা করেছে। মিলিদিও এইটা চেয়েছিল। তাই পেয়ে আজ খুশীতে উপছে পড়েছে সে।

সুশান্তর মনে হয় সে শুধাবে—এসব ছেড়ে যেতে তার এতটুকু কষ্ট হবে না? মা মারা যাবার পর একসঙ্গে দুজনে মানুষ হয়েছে। বাবা ছিলেন দূরে। এই পরিবেশে দুই ভাইবোনে একটি নিভৃত দ্বীপের পরিবেশ তৈরি করে এতদিন ছিল। সুশান্ত জানতো না যে মিলিদি এতটুকুও তার জন্য ভাবেনি। ভাবেনি বলেই—এত সহজে সে চলে যাচ্ছে এখান থেকে।

আজ সুশান্ত এত বড় পৃথিবীতে যেন বিচ্ছিন্ন—একা। মায়ের কথা মনে পড়ে। আবছা সেই স্মৃতিটা কি প্রদীপ্ত আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মিলি আর সে সেদিন মায়ের প্রাণহীন দেহটার উপর আছড়ে পড়ে কেঁদেছিল। মিলিদিই ছোট্ট সুশান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—কাঁদিস না শান্ত! মা কি চিরদিন থাকে রে? কাঁদতে নেই।

মিলিদির কান্নাভেজা সেই কণ্ঠস্বরটা মনে পড়ে। সেই মিলিদি আজ চলে গেল—তার জন্য এতটুকু ভাবে নি! সে তার নিজের জগতের স্বপ্ন নিয়েই ব্যস্ত। সেখানে হতভাগ্য সুশান্তর কোনো স্থান নেই।

ছাদের এদিকটা অন্ধকার। আলসেগুলো ভেঙে ভেঙে গেছে। বিরাট ছাদে কেউ আসে নি। নিচের মহলে, ওই কাছারিবাড়ি চণ্ডীমণ্ডপের বিস্তীর্ণ উঠানে আলো জ্বলছে—সামিয়ানার নিচে লোকজন গিসগিস করছে।

এইখানে রয়েছে অখণ্ড নির্জনতা। ঊর্ধ্বাকাশে তারাগুলো ঝকমক করে জ্বলছে প্রদীপ্ত আভায়। অমনি অন্তহীন অসীম নিঃস্বতার মাঝে আজ হারিয়ে গেছে সুশান্তর বেদনাতুর মন।

কেয়াও এসেছিল এখানে।

দু একবার দেখেছে ওই ভিড়ের মধ্যে সুশান্তকে। একটা কোঁচানো ধুতি

আর গিলে করা পাঞ্জাবিতে ওকে মানিয়েছে চমৎকার। মনে হয় ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে ক'দিনেই। সংযত, দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান ওই ছেলেটিকে এই পরিবেশে কি বিচিত্র চোখে আজ আবিষ্কার করেছে কেয়া! দেখছে মিনতির ওই নির্লজ্জ বেশবাস, আর হাসির উচ্ছল উল্লাস। অকারণে সে সুশান্তকে বিশ্রী রসিকতা করেছে। কেয়া দেখেছে—সরে গেছে সুশান্ত। মনে মনে খুশী হয়েছে কেয়া! খুশীর কারণ জানে না, তবু এটাকে অবিষ্কার করেছে সে।...

ওই কলরব থেকে সরে এসেছে। মিলি বসে আছে। ও-ই বলে—এবার তোর পালা কেয়া।

কেয়া এই উৎসব আনন্দের মাঝেও দেখেছে নিঃসঙ্গ বেদনাকে। এত দিনের জীবনটাই যেন মূল্যহীন হয়ে যাবে তার কাছে। কোনো দামই তার থাকবে না, মিথ্যা হয়ে যাবে সব পরিচয়!

এ কথাটাই ভেবেছে সে বারবার। সেই সঙ্গে মিথ্যা হয়ে যাবে সুশান্তও। এই কথাটা আজকের বিয়েতে এসে ওই সানাই-এর করুণ সুরে সুরে অনুভব করেছে। সারা মনে তাই একটা দোলা লাগে। সেও যেন একা! অন্ধকার কোনো রাতে তার পথ হারিয়ে গেছে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপরিচিত হৃদয়হীন একটি পরিবেশ, সেখানে সে অচেনা। আর একটি মানুষ, তাকেও সে চেনে না।

এমনি একটি আলোকিত শোভাযাত্রার সামিল হয়ে এসে প্রকাশ্যে তার সব কিছু ছিনিয়ে নেবার দাবি আদায় করে নেবে।

মিলিদির এই সাজগোজ করে নিজেকে বিকিয়ে দেবার সাধনার মাঝে কি একটা কাঙালপনাকেই দেখেছে কেয়া। নিজেকেও এমনি সেজেগুজে আর একজনের হাতে বিকিয়ে দিতে হবে এটা ভাবতে সে ভয়ে লজ্জায় শিউরে ওঠে।

উলুধ্বনি আর শাঁখের সুর ওঠে।

কেয়া ওই রাজ্য থেকে কি একটা আতঙ্কে সরে এসেছে।

—কে ! চমকে ওঠে কেয়া এই নিঃসঙ্গ অন্ধকার ছাদে কাকে দেখে। কণ্ঠ-স্বরে চিনতে পারে। সুশান্ত। নিজের মনের নিভৃত নিরালায় কি এক নতুন কুমারী মনকে সে আবিষ্কার করে তার বেদনায় রঙীন হয়ে উঠেছে—এমনি দুর্বলতম মুহূর্তে সুশান্তকে সামনে দেখে চমকে ওঠে সে।

সুশান্তও ভাবে নি—এসময় এখানে কেয়াকে দেখবে। আবছা তারার আলো পড়েছে ওর নরম গালে, চোখ দুটো দু'চামচ জলের মতো টলটল করছে। দুটি নিঃসঙ্গ মন কি আর্তিতে ভরে ওঠে।

সানাই-এর সুর ওঠে। কেয়ার দিকে চেয়ে থাকে সুশান্ত। তার সারা মনে এমনি বেদনার সাড়া।

—তুইও হারিয়ে যাবি কেয়া !

কেয়া এমনি করে হারাতে চায় না। তার সারা মনে কি তীব্র হাহাকার ঠেলে ওঠে।

—কেয়া !

সুশান্তকে আজ যেন বিভ্রান্ত করেছে ওই সুর। ওর সারা মনে একটা সাড়া জাগিয়েছে। কেয়াকে কাছে টেনে নেয়। ওর কঠিন দু'হাতের মধ্যে কেয়াকে আজ পেতে চায়, ও ভুলতে চায় তার মনের দুঃসহ একটা শূন্যতার বেদনাকে। ডুবন্ত মানুষের মতো চারিদিকের এই তুফানে সে এই তৃণ-খণ্ডকে অবলম্বন করে বাঁচতে চায়।

কেয়া কি আবেশে শিউরে ওঠে! সারা দেহের অণু-পরামাণুতে দুর্বার একটা চাঞ্চল্য, মনে হয় কোনো অন্ধকার অতলে সে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করারও সামর্থ্য নেই। অস্ফুট কণ্ঠে কি বলে চলেছে সে···

সেই কণ্ঠস্বরও কোন্ অন্ধকারে তিল তিল করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ কার তীক্ষ্ণ হাসির শব্দটা ওদের মুখে সারা দেহে যেন তীব্র চাবু-কের আঘাতের মতো বেজেছে ! চমকে ওঠে সুশান্ত।

কেয়া অস্ফুট আর্তনাদ করে সরে গেল।···তারার আলোয় দেখা যায়, তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মিনতি। ওর দু'চোখে কি দুর্বার হিংস্রতা।

জ্বলছে ওর দু'চোখ। হাসির জ্বালা ছিটিয়ে মেয়েটা থামল। ওদের দুজনকে দেখেছে। গরল জ্বালাভরা স্বরে বলে ওঠে মিনতি—বাঃ। বেশ নাটক জমেছিল, এতই যদি সাধ তবে চোরের মতো কেন? চল না ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে পড়গে! সুশান্ত, তুমি তো খুব গুড বয়, আদর্শবাদী। বড় বড় কথা বল।

সুশান্ত রাগে অপমানে বদলে গেছে। কি একটা দুঃসহ লজ্জা তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে। কেয়া কাঁদছে কি ভয় আর লজ্জায়। মিনতির মতো নিষ্ঠুর নীচ একটা মেয়ে আজ ইচ্ছে করেই তাদের এই দুর্বলতার সন্ধান করছিল, আর সেটা পেয়ে গিয়ে আজ চরম অপমান করবে তাদের। সুশান্ত মিনতির দিকে চাইল ঘৃণাভরা চাহনিতে। কেয়ার দু'চোখ ফেটে জল নেমেছে। মিনতি ওদের সব কিছুকে আজ নিদারুণ ঘৃণায় ধিকৃত করে গেছে। সেই অপমানের প্রতিবাদ করার সাধ্যও সুশান্তর নেই।

কেয়া ওর দিকে চেয়ে নেমে গেল। কেয়াও আজ সুশান্তকে যেন সহ্য করতে পারে না। ওর জন্যই তাকেও এই অপমানের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আর সেই দুঃসহ অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথও তার জানা নেই।

সুশান্ত কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া নেমে গেছে নিচে। কোনো-মতে পালিয়ে গিয়ে ও এখান থেকে দূরে সরে যেতে চায়।

সুশান্ত মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকে। মিনতির চোখের সেই জ্বালা কমে গেছে, তাতে ফুটে উঠেছে কি একটা মাদকতা। ওর মাংসল দেহের দিকে চেয়ে থাকে সুশান্ত। মিনতি এগিয়ে আসে। বলে ওঠে সে—কেয়া খুব সুন্দরী—না? ওকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ে না?

সুশান্ত চমকে ওঠে। মিনতির দু'চোখে কি একটা নেশা। সুশান্ত দাঁড়াল না, নেমে গেল নিচে। মিনতি ওর পথের দিকে চেয়ে রইল। নীরব রাগে গর-গর করছে সে। তার মনের কোণে সাপের হিংস্রতা মাথা তুলেছে। ও যেন কালনাগিনী। ফণা ধরে ফুঁসছে সর্বাঙ্গে ওর নিষ্ফল গরল জ্বালা।

সুশান্তও তাকে অপমান করে গেল। মিনতি শমীকের সঙ্গে মিশেছে তার

নিজের স্বার্থে, একটা কাজকর্ম তার হয়ে যাবে। শমীক যে তার পুরো দাম উশুল করেছে এটা শমীকের মনের নোংরামিই। তার মতো লোভী ছেলের পক্ষে এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

মিনতির মনের যোগ এখানে নেই। সব অপমান আর লাঞ্ছনাকে সে মাথা নিচু করে সহ্য করতে বাধ্য হলেও মনের অতলে জমে উঠেছে তার শুধু পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

সুশান্তর কাছে সে চেয়েছিল অন্য কিছু। ওর দু'চোখে সে খুঁজে ছিল তার নিজের স্বীকৃতি। কিন্তু মিনতি সেখানে বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

আজ মিনতি দেখেছে সুশান্তর মনের অতলে তার জন্য কোনো আশ্বাস নেই, সান্ত্বনা নেই। সুশান্তও তাকে ঘৃণা করে। তাই এড়িয়ে গেল।

—অ্যাই বে! আমি খুঁজে খুঁজে সারা আর তুমি এখানে রয়েছ?

শমীক ছাদের দিক থেকে সুশান্তকে নেমে আসতে দেখেছিল ব্যস্তসমস্ত ভাবে। শমীক একটু অবাক্ হয় ওকে দেখে। সুশান্ত যেন কি একটা ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে নামছে। শমীক খুঁজছিল মিনতিকে।

আজ উৎসবের রাতে সেও ওই অতিথি সৎকারের ফাঁকে ফাঁকে দু-চার পাত্র গিলেছে। ভালো কোম্পানীর নামকরা জিনিস, তার উত্তাপ ওর সারা দেহ মনে। উৎসবমুখর পরিবেশ তাই এমনি রঙিন হয়ে উঠেছে।

কি ভেবে ছাদের দিকেই এসেছে শমীক। নিচে ভিড় আর লোকজনের কলরব থেকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে দাঁড়াতে গিয়েওদিকে মিনতিকে দেখে একটু অবাক্ হয়। মেয়েটাকে এখানে দেখবে ভাবেনি। সুশান্তকে নেমে যেতে দেখেও কিছু সন্দেহ করেনি সে। কিন্তু মিনতিকে দেখে অবাক্ হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকে। শমীক শুধায়

—এখানে কি হচ্ছিল, এ্যাঁ!

ওর কণ্ঠস্বর জড়িত, নেশাটা বেশ জমেছে। মিনতি দেখছে ওকে। ওর চাকরিটা করে দিয়েছে শমীক যোগাযোগ করে। তার জন্য অনেক অপমানই সহ্য করেছে মিনতি। ওর সবকিছুই ওই দস্যুটা লুট করে নিয়েছে।

আজ তাকে সে সারা মন দিয়ে ঘৃণা করে।

শমীক শাসনের সুরে বলে—জবাব নেই যে! এ্যাঁ। রাসলীলা হচ্ছিল বুঝি ওই শান্তকে নিয়ে?

মিনতি দপ করে জ্বলে ওঠে। তার সব কিছু যেন ওই শয়তান দখল করে নিয়েছে। মিনতি জবাব দেয়—আমার খুশী!

—খুশী! ছিনেলী করার জায়গা প্যাও নি? শমীক গর্জে ওঠে। ওর সারা শরীরে মত্ত হাতির শক্তি এসেছে। নীল রক্তে মাতন জাগে। কি দুর্বার লালসা আর দখলদারী লোভ নিয়ে পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মেয়েটার ওপর। বাধা দেবার শক্তি নেই মিনতির। ওর সবশক্তি ওই পশুর দাপটে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে কোন্ অতল গহ্বরে নেমে চলেছে সে। দূর হতে দূরে মিলিয়ে যায় সানাইয়ের করুণ সুরটা। চোখেরসামনে ভেসে ওঠে সুশান্তর ঘৃণাভরা চাহনি—দূর আকাশের তারার মতো জ্বলছে। ওকে সকলেই ঘৃণা করে—দুর্বিষহ সেই ঘৃণা।

কি লজ্জায় অপমানে মেয়েটা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। আজ মনে হয় সে ঘৃণ্য অপমানিত একটা জীব। ওই শমীকের মদমত্ততা তাকেও চরম অপমান করেছে। মিনতি কাঁদছে।

সুশান্ত কি একটা ভয়ে তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো পালাচ্ছে। ওর কাছে আজ মানুষের মনের অতলের একটা অন্ধকার জগৎ চকিতের জন্য বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখেছে নগ্ন একটা রূপ। নিজের মনের এই লালসাটাকে সে আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছে। আজ সবচেয়ে বেশী অপ-মান করেছে কেয়াকে।

ওর চোখে দেখেছে ঘৃণা আর কান্নার জমাট একটা আবেশ। এ সে চায় নি কিন্তু সেই সর্বনাশটাই ঘটে গেছে। লজ্জায় অপমানে শিউরে উঠেছে সুশান্ত। উৎসবমুখর ওই আলোভরা জগৎ ঢেকে গেছে অন্ধকারে। দেখেছে ওই নাগিনীর মতো হিংস্র মিনতিকে।

এই জগতটাকে সে জানতো না। কিন্তু নতুন সেই তমসার জগৎ তার সব

স্বপ্নকে, সব আলোকে ডুবিয়ে দিয়েছে দুঃসহ ঘৃণায় আর লজ্জায়।
ভিড় থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ওর ইচ্ছে করে এখান থেকে বহু দূরে কোথাও সরে যেতে। এদের কাছে সে একটা অতি সাধারণ জীবমাত্র, ওর অন্তরে রয়েছে লালসার বীজ। কোনো স্বপ্ন নেই, সত্য নেই। শমীকের মতো সেও নীল রক্তের নেশার জগতের মানুষ। শমীক অনেক পরিষ্কার, কিন্তু সে আরও কপট, আরও ভণ্ড।
নিজের উপরই আসে দুঃসহ ঘৃণা।

আলোভরা বাড়িটায় কলরব উঠেছে। লোকজন যাতায়াত করে। কাঙালীর দল এদিকে ওদিকে বসে আছে কিছু খাবার আশায়। সমারোহ চলেছে। সানাইয়ে বাজে কানাড়ার সুর।
সব কিছুই শূন্য বলে বোধহয় সুশান্তর কাছে। হঠাৎ প্রভাতকে সাইকেল নিয়ে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল। উস্কোখুস্কো চেহারা। প্রভাত ওকে দেখেই নেমেছে সাইকেল থেকে। বলে সে—তোর সন্ধানেই আমি আজ এসেছিলাম। ক'দিন প্রভাতের দেখা পায় নি। সেইদিন প্রভাত ওকে যা তা বলে বের হয়ে গেছল। সুশান্ত রাগ করে নি। কিন্তু বুঝেছিল প্রভাতের মনে নতুন একটা জগৎ গড়ে উঠেছে। এতদিনের বন্ধুত্বকেও সেই মত-বাদের আলোয় সে চিনে নিতে চায়, যাচাই করতে চায়। তার কাছে একটা সত্য রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।
এই প্রভাতের সত্ত্বাকে সুশান্ত খানিকটা জেনেছে। প্রভাত এদিকে আসে নি। হয়তো তাদের সান্নিধ্য এড়িয়ে যেতে চায়।
প্রভাত বলে—বাবা, মা, কেয়া—সবাই এখানে। বাড়িতে চাকরটা ঝিমুচ্ছে। তাই তোকেই খুঁজতে এলাম।
প্রভাত জানায়—কিছু টাকার দরকার, এখুনিই। গোটা পঞ্চাশ। বাড়িতে মা থাকলে তোকে জ্বালাতন করতাম না।
—কেন? এই রাতে টাকার কি দরকার? সুশান্ত ওকে শুধালো।

প্রভাত যে একটা কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত রয়েছে তা বোঝা যায়। মুখ চোখ শুকনো, চুলগুলোয় তেল পড়ে নি, জামা কাপড়ও ময়লা। প্রভাত জানায় —নিবারণবাবু মারা গেলেন!

চমকে ওঠে সুশান্ত। কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারে না সে। এ গ্রামের একটি ধারণা, একটি সত্যরূপবিধৃত হয়েছিল নিবারণবাবুকে কেন্দ্র করে। উনি ছিলেন অতীতের বিদ্রোহের একটি মাত্র শিখা—যা আজকের ঝড়েও নিভে যায় নি, পথভ্রষ্ট হয় নি। বিপিনবাবু আজ এমনি দিনে এসেছে সানাই বাজিয়ে মালাবদল শুভদৃষ্টির পুলক উপভোগ করে সংসার বাঁধতে। বাকী জীবন সেই সংসারের দোহাই দিয়ে লুণ্ঠনপর্বকে কায়েম করতে।

আর তার পাশে ওই সবত্যাগী নিবারণবাবুর এমনি করুণ মৃত্যু যেন পরিহাসের মতোই ঠেকে। শেষকৃত্য করার সঞ্চয়ও নেই। আজীবন সব দিয়ে গেছেন তিনি, শেষ দিনেও তাই শূন্য হাতে ফিরে গেলে।।

সানাই বাজছে। কলরব হাসির শব্দ ওঠে আলোভরা জগতে। উলুধ্বনি হচ্ছে।

প্রভাত সুশান্তকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েথাকতে দেখে শুধায়—কি রে? টাকা আছে? সুশীলদাও নেই—কি যেকরি! টাকা না থাকে তোর কাছে, দেখি অন্য কোথাও পাই কি না? প্রভাত সাইকেলে উঠতে যাচ্ছে। সুশান্তর সম্বন্ধে তার ধারণাটা আজ বদ্ধমূল হয়ে যায়। ও যেন আলাদা শ্রেণীরই। হঠাৎ সুশান্তর ডাকে থামল প্রভাত। ওকে দেখে অবাক্ হয় প্রভাত। সুশান্তর দু'চোখে জল টলটল করছে। সুশান্ত এতক্ষণ বোধহয় নিজের অন্য কোনো সত্তার সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল।

সুশান্ত বলে—চল, টাকা আমার সঙ্গেই আছে।

অবাক্ হয় প্রভাত।—কাঁদছিস তুই নিবারণবাবুর মরার খবর পেয়ে? আবায় এই বিয়ের ব্যাপার ফেলে রেখে চলে যাবি? ওরা কি বলবে? তোর বাবা, কাকা?

সুশান্ত নিজের অনেক পাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কেয়াকে যে

অপমান করেছে সেটা শুনেও প্রভাত এখুনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তবু সেই অপমানটাকেও সহজভাবে মেনে নেবার সংসাহস তার থাকবে। তেমনি সাহসই যে মনে মনে পেতে চেয়েছে। বাবা কাকামণি যা ভাববেন ভাবুন, তার নিজের মতকেই সে প্রকাশ করবে। বিপিনবাবু মহাগুরু-নিপাতের দিনে নিজেকে এমনি করে বিকিয়ে দিতে পারে, কিন্তু সুশান্ত তার প্রতিবাদই করবে।

তাই জানায় সুশান্ত—সব কিছুর জন্যই তৈরি আমি। আজ না হোক কোনোদিন না কোনোদিন মুখোমুখি হতেই হবে প্রভাত। সেটা যত তাড়াতাড়ি আসে আসুক।

প্রভাত ওকে দেখেছে। ওই আলো উৎসবমুখর পরিবেশ একটা মধুর স্বপ্ন জড়োনো প্রচুর্যের জগৎ থেকে একটি তরুণ যেন সব কিছু মোহকে পিছনে ফেলে অন্ধকার বন্ধুর পথে পা বাড়ালো। প্রভাতকে ত্যাগ করতে হয় নি, তেমন কিছু মুখোমুখি হতে হয় নি বিশেষ কোনো বাধার। তার তুলনায় সুশান্তকে অনেক বেশী সংগ্রাম করতে হবে। হয়তো হারাতে হবে অনেক কিছুই। তবু এগিয়ে এল সে।

প্রভাত বিস্মিত স্বরে বলে—তোকে ভুল বুঝেছিলাম শান্ত।

সুশান্ত সহজ স্বরে বলে—সেইটাই স্বাভাবিক। আমিই হয়তো অস্বাভাবিক—হয়তো এই দিনগুলোই। নিবারণবাবুরাও রইলেন না। ওদের সব আলো নিভে গেল, তলিয়ে গেল অন্ধকারে। প্রভাত ওকে দেখছে। বিয়ে বাড়ির আলো এখানে নেই, পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে তারাজ্বলা আকাশ, জোনাকিজ্বলা পথ। নির্জন রাতের বাতাসে শনশন শব্দ ওঠে। দুটি তরুণ অমনি অন্ধকারে চলছে কোনো মৃতের জগতের পানে। আদর্শের মৃত্যু—স্বপ্নের মৃত্যু—ভবিষ্যতের মৃত্যু আনা সেই জগৎ। ওরা তারই যাত্রী।

জবাব দাও কোথায় ছিলে?

অনেকগুলো মুখ ভিড় করে আছে। কাকামণি শুনেছেন সব কথাই। কাল

রাত থেকে ওই ছেলেটা চলে গেছে, ফিরেছে সকালে।

সুশান্তর চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। রাত্রির অন্ধকারে দেখেছিল সে নিবারণবাবুকে শেষবারের মতো।

অসহায় মানুষটি যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন আজীবন সেই স্বাধীনতাকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন, জানতে ইচ্ছে করে সুশান্তর। কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে পারবেন না।

জীর্ণ শয্যায় এই হতদরিদ্র পরিবেশে বিনা চিকিৎসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন। কিন্তু আজীবন করে গেছেন আপোষহীন সংগ্রাম।

বিপিনবাবুরা দিন ফিরিয়ে নিয়েছেন, বিপুলবাবু আজ মান্যগণ্য লোক, কিন্তু নিবারণবাবুরা এমনি করেই হারিয়ে যান।

অবাক্ হয়ে গেছল সুশান্ত ওই নিরাভরণ নগ্ন দারিদ্র্য আর ওই মৃত্যুকে দেখে। মনে হয়েছিল সবই মিথ্যা, সত্যের জয় প্রতিষ্ঠা হবে কবে? নিবারণ-বাবু কি তাহলে ভুলই করেছেন?

—জবাব দাও! বসন্তনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

বিপিনদাও এসেছেন। গত রাতেব বিয়ের বাসরসাজ তখনও ওর পোশাকে ফুটে রয়েছে। সুশান্ত দেখছে নিবারণবাবুর জীর্ণ দেহটা পুড়ে পুড়ে আঙ্গরা হয়ে গেল নির্জন নদীতীরে। ভোরের আলো ফুটে ওঠে নদীর বালুচরে, কুয়াশার জমাট আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। চিতার আগুন নিভিয়ে দিয়ে-ছিল তারা ময়ূরাক্ষীর জলধারা দিয়ে। একটি বিপ্লবী জীবনের শেষ সমাধি রচিত হয়ে গেল।

—চল শান্ত। বাড়ি চল! প্রভাত ওকে ডাকছে।

সুশান্তর চমক ভাঙে। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। প্রভাতের চোখ ছল-ছল করে।

—সব শেষ হয়ে গেল শান্ত।

সুশান্ত বলে—না। ওই আগুন নেভে না প্রভাত, আকাশ জুড়ে কি আভা দেখছিস?

—ও তো সকালের আলো। প্রভাত জবাব দেয়।

—সকালের আলোর মতো নিবারণবাবুও সত্যি হয়ে থাকবেন, প্রভাত, ওঁদের মৃত্যু নেই। যেখানে অন্যায় বঞ্চনা সেখানেই ওঁদের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে পথ দেখাবে।

বসন্তনারায়ণ বলে—জানি কোথায় ছিলে সারা রাত! লজ্জা করে না তোমার, কে না কে মরলো অমনি শিয়াল কুকুরের মতো দৌড়তে হবে?

বলে ওঠে সুশান্ত—নিবারণবাবু শিয়াল কুকুরের পর্যায়ের নিশ্চয়ই নন। বিপিনদাও আজ ওই সত্যটা স্বীকার করেন? শুনেছি তিনিই ছিলেন আপনার রাজনৈতিক গুরু!

বাবা গর্জে ওঠেন—সুশান্ত! বয়স্ক গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বলতে হয়, সেটাও ভুলে গেছ?

সুশান্ত বোঝাতে পারে না যে সম্মান অর্জন করারও যোগ্যতার দরকার। সেই যোগ্যতাকে বিপিনবাবু অনেকদিন আগেই কাঞ্চনমূল্যে বিকিয়ে বসে আছেন। তবু সেই শূন্য পাত্রকেই প্রণাম করার মতো মানসিক দৈন্য তার নেই। ওদের মতবাদকে, এই প্রতিষ্ঠা কুড়োনোর প্রবৃত্তিকে সারা মন দিয়ে ঘৃণা করে সে।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্থির কণ্ঠে বলেন—দেখছি তোমারও শিক্ষার দরকার। আর এই দুঃসাহসকে কোনোদিনই প্রশ্রয় দেব না আমি। দরকার হয় জানাবো আমার কেউ নেই। একমাত্র মেয়েরও গোত্রান্তর হয়ে গেল, আর তুমি—

সুশান্ত স্থির কণ্ঠে জানায়—কোনো অন্যায় আমি করি নি।

—কৈফিয়ত আমি চাইছি না। আমি বলছি এটা অন্যায়। এই কথাটাই তোমায় মানতে হবে, আর তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে তোমায়।

ওরা সমবেতভাবে তার কণ্ঠরোধ করতে চায়। বিপিনবাবুই বলে—ওসব কথা এখন থাক। পরে আলোচনা করা যাবে।

ও প্রসঙ্গ তখনকার মতো চাপা দিতে চেষ্টা করেন বিপিনবাবু। হয়তো তাঁর

মনের এই আলোর জগতেও নিবারণবাবুর মৃত্যুটা কিছু সাড়া এনেছে। আজ তিনি প্রতিপক্ষ, তাই ওর কথাগুলোর অন্য অর্থ হতে পারে।

বিপিনবাবু বলেন—নিবারণবাবুকে তবু অনেকে শ্রদ্ধা করে কাকামণি। তাঁকে মৃত্যুর পরও আমরা এ সম্মানটুকু দেখাই নি এ কথা শুনলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। তাই এ নিয়ে কোনো আলোচনা না হওয়াই ভালো।

বসন্তবাবু প্রেসিডেন্টের ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, কথাটা তাঁর মাথায় ঢোকে। এখন লোকের মনে আঘাত দেবার মতো কিছু করা উচিত হবে না।

বিপিনবাবু বলেন—সেদিন বরং সুশান্ত ওখানে গিয়ে ভালোই করেছে। তবু এ বাড়ির একজন দাঁড়িয়ে থেকে শেষ সম্মান দেখিয়ে এসেছে, আপনার প্রচারের হয়তো সুবিধাই হবে।

চমকে ওঠে সুশান্ত, তার মনে এসব কথা আসে নি। ওরা তার শ্রদ্ধাকেও এমনিভাবে তাদের নিজের প্রয়োজনে লাগাবে তা ভাবে নি, তাই প্রতিবাদ করে সে—এসব ভেবে যাই নি বিপিনদা। আমি শ্রদ্ধা করতাম তাঁর আদর্শকে।

হরিশমাস্টার এইবার যোগান দেয়—ওই একই কথা। আহা, বংশের মুখ রেখেছো বাবা।

সুশান্ত ঘৃণায় লজ্জায় সরে এল সেখান থেকে। ওরা সব কিছুর মূল্য খতিয়ে দেখে নিজেদের স্বার্থের মাপকাঠি দিয়ে। শমীক চেয়ে দেখছে ওকে। সুশান্ত বের হয়ে আসছে। শমীক ওর পিছু পিছু এসে বলে—বেড়ে চাল-খানা দিইছিস শান্ত। খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল বুঝলি। নিবারণবুড়োর একটা স্মৃতিসভা লাগাতে হবে জুত করে।

শমীকের দিকে চাইল শান্ত। এর থেকে ওই কাকামণি, বাবা যদি তাকে শাস্তি দিতেন সে অখুশী হতো না। বিপিনদাই তার পাটোয়ারী বুদ্ধি দিয়ে ওদের চোখ খুলে দিয়েছে।

শমীক ফিসফিসিয়ে ওঠে—ছুঁড়িটাকে হাতিয়েছিলি না ভয়ে দৌড়েছিলি

রে ? এ্যা—

চমকে ওঠে সুশান্ত। কেয়ার সঙ্গে কালকের রাতের সেই ঘটনাটা মনে পড়ে। ওসব চিন্তা তার মনেও ছিল না হঠাৎ কালো দাগটা ভেসে ওঠে। চারিদিক তার শূন্য, তার মাঝে ওই যন্ত্রণাটায় যেন কাতর হয়ে পড়ে সে।

শমীকের দিকে চাইল অসহায় চাহনিতে।

শমীক হাসছে। ওই মিনতির কথা রে ? মেয়েটা তোকেও যেন লভ করে বলে মনে হল। তা বেশ তো, আরে এ তো আকচার হয়। ব্যাটাছেলে, এতে লজ্জার কি আছে ? এ্যাঁ !

টেনে টেনে হাসছে শমীক। সুশান্তর সারা দেহ ঝিমঝিম করছে। কাল থেকে খাওয়া নেই। সারা দেহ মনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। কোনোরকমে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। জানে সুশান্ত, তাকে কেউ ডাকাডাকিও করবে না। এ বাড়ির মানুষদের হিসাব থেকে সে এর মধ্যেই বাতিল হয়ে গেছে ?

বিয়ে বাড়িতে সমারোহ সানাই-এর আনন্দ, কলরব থেকে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসন মেনে নিয়েছে ! এখানের সে কেউই নয়।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ; ঘুম ভাঙতে দেখে, বেলা গড়িয়ে পড়ছে। কেউ তাকে ডাকে নি। তাকে ডাকার দরকারও বোধ করে নি কেউ। সানাই বাজছে, মেয়েদের উলুধ্বনি শোনা যায়। সুশান্ত জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। মিলিদি আর বিপিনবাবুরা বিদায় নিচ্ছে। বৈকালে পড়ন্ত রোদে ম্লান আভায় উদ্ভাসিত আরক্তিম রাগের আভাস পড়েছে মিলিদির মুখে, কি বিষণ্ণতায় ভরা ওর চাহনি। লাল বেনারসী শাড়ি গায়ে, এক গা গহনা, মাথায় পাতলা রেশমী ওড়নায় ঢাকা মুখখানা।

সব হারিয়ে গেল ওরা। বাড়ির সকলেই সমবেত হয়েছে ওখানে। বাবা, কাকামণি, বিলু, শমীক, কাকীমা আরও সকলেই মিলুদির এই বিদায় মুহূর্তে তার কেউ খোঁজও করে নি।

বাবা, কাকামণি ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এদিকে কাকীমা, বিলু, বাড়ির অনেক আত্মীয়স্বজনও রয়েছে। সকলকে ভালো চেনে না সুশান্ত। শমীকের পরনে গরদের পাঞ্জাবি, বাহান্ন ইঞ্চি চওড়া পাড় কোঁচানো ধুতি, হাতের মুঠোয় ধরা আছে কোঁচার মাথাটা। সেটাকে একটা ফুলের মতো করা হয়েছে। হীরা বসানো বোতাম ঝকঝক করে তার জামায়। সুশান্তর ওসব সাজপোশাক নেই, ওসব কেউ কোনোদিন দেয় নি তাকে। তা ছাড়া ওই পোশাক পরে দাঁড়াতেও পারবে না সুশান্ত।

শাঁখ বাজছে, মিলিদির মুখে পড়েছে দিন-শেষের সূর্যের একটু আলোর আভা, চোখে জল। ওর মুখখানা দেখে চমকে ওঠে সুশান্ত। মায়ের কথা মনে পড়ে, সেই স্মৃতিটাও অপরাহ্ণের বিদায়ী আলোয় এমনি মলিন বিষাদে ম্লান।

তার মাও কোথায় হারিয়ে গেছে। মায়ের আদল পেয়েছে মিলিদি।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুশান্ত। বিপিনদা গরদের পাঞ্জাবি পরে টোপর মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। গুরুজনদের প্রণাম পর্ব চুকিয়ে ওরা গাড়িতে উঠল।

সুশান্ত তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ওরা চলে গেছে। জায়গাটা এখন জন-শূন্য। ওখানে একটু আগে জীবন নাট্যের যে পালাগান হয়ে গেল তার সাক্ষীরাও আর নেই সেখানে। একটা অন্তহীন শূন্যতা সেই ঠাঁইটায় বিরাজ করছে। ক্রমশ দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে সব কি অন্ধকারে ঢেকে গেল —হারিয়ে গেল।

সুশান্তর সারা মনের অতলে এমনি তমসার কালো ছায়া তার জীবনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের মাঝে একটা যবনিকাপাত হয়ে গেল। ও যেন ওই ধ্বসে পড়া বাড়িটার আর কেউ নয়। তুজনে একত্রে ছিল এখানে। মিলিদিও আজ চলে গেল অন্য জগতে। সেখানে ওর জন্য রয়েছে আশা আনন্দ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি ভবিষ্যৎ।

তার সামনে কি আছে জানে না। ওদিকে গোলাবাড়ির সেই উঁচু কালো

শেওলাধরা প্রাচীরগুলো সব দৃষ্টিপথ আছন্ন করেছে, সেই তমসার ওদিকে কি আছে তার জানা নেই।

কেয়া!···এই স্মৃতিটা পরিণত হয়েছে দূর আকাশের বুকে নক্ষত্রের ওই ম্লান শিহরণ আনা দীপ্তিতে। ক্ষণিকের ভুলে সব আলোকে সে হারিয়ে ফেলেছে। একটা দুঃসহ নীরব বেদনা তাকে পীড়িত করে।

কেয়ার কাছে মুখ দেখানোর উপায় সে রাখে নি। সবকিছু নিজের ভুলে সে শুধু হারিয়ে ফেলেছে—নিজের চারিদিকে তুলেছে দুঃখের তমসাময় বাধাপ্রাচীর। সেই প্রাচীর ভাঙার সাধ্য তার নেই। রাতের বাতাসে ওঠে শুধু বেদনার হাহাকার। একটা রাতজাগা পাখী এই ধ্বংসপুরীতে কি বুক-ভরা বেদনা নিয়ে ডেকে ডেকে থেমে গেল।

অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা যায়।

হ্যারিকেনের আলোর আভা পড়েছে বাবার কঠিন মুখে। সুশান্ত বাবাকে দেখছে। নরেন্দ্রনারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে থাকেন। লক্ষ্য করছেন, সুশান্ত মিলির চলে যাবার সময়ও ছিল না। ওর ব্যবহারে নীরব একটা কাঠিন্য আর বিদ্রোহের সুরই ফুটে উঠেছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ বলেন—কালই আমার সঙ্গে যেতে হবে, হোস্টেলে থাকবে। ব্যবস্থা করে আমি ফিরে যাবো।

কঠিন নির্মম একটি কণ্ঠস্বর। সুশান্তর মনে হয় বিদ্রোহ করবে। কিন্তু এখানেও তার থাকার কোনো ইচ্ছা নেই। সেই কারণেই এই কথার প্রতিবাদ সে করল না। বাইরের নতুন জগতে হারিয়ে যেতে চায়—তার পথ খুঁজে নিতে চায় সুশান্ত।

বাবার পায়ের শব্দটা ক্রমশ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!